

নবীজির দিনলিপি



দ্রষ্টব্য

- ➡ বইটিতে যখন কোনো ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তখন কেবলমাত্র একটি বিবরণে লেখক নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি; বরং একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন সহীহ বিবরণ একত্র করে সম্পূর্ণ ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সে কারণে বইয়ের পরিশিষ্ট অধ্যায়ে রেফারেন্সের একটি বিশদ তালিকা যুক্ত করা হয়েছে, যার অধিকাংশই হাদীসের কিতাব। এসব কিতাবে বর্ণিত বিবরণগুলো একত্র করলে বইয়ে বর্ণিত ঘটনাবলির সত্যতা যাচাই করা যাবে। কিছু কিছু ঘটনা একাধিক উৎস থেকে সাহায্য নিয়ে লেখা হয়েছে। এ কারণে হাদীসের বর্ণনাভঙ্গি গতানুগতিক ধারা থেকে কিছুটা ভিন্ন।
- ➡ শুধুমাত্র সহীহ হাদীস থেকে বর্ণিত ঘটনাবলি সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কিছু ঘটনার বিবরণের সনদে হালকা দুর্বলতা রয়েছে (যা সাধারণত সীরাতের বইয়ে থাকে)। কিন্তু বইটিতে শুধুমাত্র সেই বিবরণগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে, যার সমার্থক বিবরণ সহীহ সূত্রে পাওয়া যায় অথবা যা সহীহ বর্ণনার পরিপূরক। এই বইয়ে কোনো জাল বিবরণ উল্লেখ না করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

বিষয়সূচী

দ্রষ্টব্য.....	৫
দিনের প্রথম প্রহর	২৩
সাত-সকালে নবীর সাথে	৩৩
ফের মসজিদে	৪০
মদীনার পথে	৫৩
চারপাশ পরিদর্শন	৫৮
অসুস্থ ব্যক্তির পাশে	৬৭
মদীনার বাগানে	৭০
প্রিয়নবীর কায়লুলা	৭৩
গন্তব্য যখন কুবা	৭৯
পড়ন্ত দুপুরে	৮১
আসরের ওয়াক্তে	৮৮
সূর্যাস্তের পর.....	৯৫
সালাতুল ইশা.....	১০১
রাতের প্রথম প্রহরে.....	১০৩
গভীর রাতে নবীজি ﷺ-এর সাথে	১০৯
গভীর রাতের ভ্রমণবীথি	১২০
ভোরের পূর্বে ঈষৎ ঘুম	১২৪
নবীজি ﷺ-এর সমগ্র দিনের কার্যবিধির আলোকে একটি পর্যালোচনা	১২৫
গ্রন্থপঞ্জী	১৪২

লেখক পরিচিতি

শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু নাসির আত-তুরাইরি সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থিত ‘ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়’ থেকে আলিমিয়াহ কোর্স সমাপ্ত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সেখানে ‘উলুমে শরীয়াহ’ এবং ‘উলুমে সুন্নাহ আন নাবাবিয়াহ’ এর ওপর ইয়াজাত লাভ করে পরবর্তী সময়ে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদে যোগ দেন। তিনি সেখানকার শিক্ষা বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ‘জামে আল মালিক আব্দুল আজিজ’ মসজিদে খতিবের দায়িত্বও পালন করেন। এ ছাড়া তিনি সৌদি আরবের ব্যাংক অফ ফিন্যান্সের শরীয়াহ বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

তার বিখ্যাত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ইমাম কুরতুবী ওয়া মানহাজু ফী শারহ সহীহ মুসলিম (যা উনার পিএইচডি থিসিস ছিল), লাওহাত নাবাবিয়াহ, হাদীস আল ঘাদির, কাআন্নাকা মায়াহ, আলইয়াওম আন নাবাবিয়াহ, কিসাস নাবাবিয়াহ প্রভৃতি।

লেখকের কলাম

যে সকল মূলনীতির আলোকে আমি এই বইটি রচনা করেছি

- ➡ এই বই লেখার পরিকল্পনা আজ থেকে বিশ বছর আগে মাথায় আসে। আমি তখন আমার ভাই ও বন্ধু আব্দুল আজিদ আল মাজিদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর সাথে আলাপ করছিলাম। আইডিয়াটি মূলত আমার প্রয়াত ভাই-ই দিয়েছিলেন। আমার মনে আছে তিনি বলছিলেন, এটি এমন আঙ্গিকে রচিত হতে পারে, যা ‘নবীজি ﷺ-এর দিনলিপি’ হিসেবে বরিত হবে। যখন মদীনায় সাহাবীগণ পানি নিয়ে আসতেন আর নবীজি ﷺ তাতে হাত ডুবিয়ে দুআ করতেন—এই ঘটনাটি তিনি আমাকে হাত নেড়ে নেড়ে বর্ণনা করছিলেন। এই দৃশ্যটি আমার অন্তরকে নাড়া দিয়েছিল। তার কথাগুলো আমার কানে বাজত। আল্লাহ তাআলা যেন আমার ভাইয়ের আমলনামায় এই বইটিও এমন ইলমের অবদান হিসেবে লিখে রাখেন, যার ধারা মৃত্যুর পরেও চলমান থাকে। এই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরামর্শ দেয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলা যেন তাকে উত্তম বিনিময় দান করেন। রাহিমাহুল্লাহ।
- ➡ রাসূল ﷺ-এর রুটিন নিয়ে বই লেখার পরিকল্পনাটি আমার মনকে আন্দোলিত করতে থাকে এবং আমি এ-ব্যাপারে গবেষণা করতে থাকি। আমি প্রথমে নবীজির একটি সংক্ষিপ্ত দিনলিপি রচনা করে আমার শায়খদের, শিক্ষকদের এবং ভাইদের কাছে প্রেরণ করি। তাদের সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও সংশোধনের দ্বারা আমি ব্যাপকভাবে উপকৃত হই। তাদের পরামর্শগুলো গ্রহণ করে এ বইতে আমি তা আরও উত্তমরূপে সন্নিবেশিত করতে পেরেছি। আল্লাহ যেন তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন।
- ➡ এই বইয়ের লক্ষ্য হচ্ছে নবীজি ﷺ-এর সমগ্র দিনের কার্যকলাপের একটি পরিপূর্ণ দৃশ্য ধারণ করা। এতে করে আমরা নবীজির জীবন থেকে অনুসরণীয় আমলগুলো নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে আসতে সক্ষম হব। যাতে নবীজির জীবন থেকে

শিক্ষা নিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারি।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।”^১

আমাদের জীবনের কার্যাবলিগুলো কীভাবে সবচেয়ে সুন্দরভাবে, সংগতভাবে সম্পাদন করা যায় সে প্রশ্নের উত্তর আমরা নবীজির সমগ্র দিনলিপি মধ্যে, নববী জীবনের প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে খুঁজে পাব। আমরা সবাই সেই উদাহরণগুলোর সন্ধান পাব, যা সবচেয়ে মহিমান্বিত হওয়া সত্ত্বেও মানবিকভাবে তা সম্পাদন করা ও আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

“...বলুন, মহাপবিত্র আমার মালিক, আমি শুধু (তাঁর পক্ষ হতে) একজন মানুষ, একজন রাসূল ব্যতীত কিছু নই।”^২

➡ সীরাতিবিষয়ক অধিকাংশ বই ঐতিহাসিক ঘটনাবলি দ্বারা সজ্জিত এবং নবীজি ﷺ-এর জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ সম্বলিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এই বইটিতে রাসূলের জীবনীকে ভিন্ন আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর দৈনন্দিন কাজ ও অভ্যাসের আলোকে মূলত এ বইটি লেখা হয়েছে। উভয় পন্থাই আমাদের জন্য দরকারী। বস্তুত, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে রাসূলের জীবনী নিয়ে আমাদের গবেষণা করা উচিত। রাসূলের বিস্তৃত জীবনী ও সুবিশাল অবদান আরও বেশি অধ্যয়নের দাবি রাখে।

➡ বইয়ে বর্ণিত সকল ঘটনাবলি রাসূল ﷺ-এর জীবনে একই দিনে সংঘটিত হয়নি। একটি দিনে যা ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই তা অন্য সব দিন ঘটেনি, ঘটার প্রয়োজনও

[১] সূরা আল-আহযাব, ৩৩:২১

[২] সূরা ইসরা, ১৭:৯৩

পড়েনি। কিন্তু এসব ঘটনাবলিকে সম্পূর্ণভাবে সমন্বয়করণের মাধ্যমে এক দিনে রাসূলের সম্পাদিত সকল কার্যাবলির চিত্র অনুধাবন করার কাছাকাছি আমরা যেতে পারি।

- ➡ রাসূল ﷺ দিনের কোনো সময়ে কোনো কাজগুলো করতেন তা অনুমান করার জন্যে আমি কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করেছি। কিছু ক্ষেত্রে হাদীসের বিবরণ স্পষ্টভাবে নির্দেশ প্রদান করে যে, দিনের কোনো সময়ে কোনো কাজগুলো সম্পাদিত হয়েছে। আবার কখনো আমি কিছু আমল ও অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে ঘটনাবলি সাজিয়েছি, যেগুলো ঘটনাবলি ঘটার সম্ভাব্য সময়ের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে। এই ইঙ্গিতগুলোর মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। তাই পাঠক পড়ার সময় সতর্ক থাকবেন। আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেক ঘটনা তার যথাযথ সময়ে, যথাযথ প্রেক্ষাপটে, বর্ণনাকারীর ভাষ্য অনুযায়ী বর্ণনা করতে। কিন্তু মানবীয় চেষ্টা-সাধনা ত্রুটিমুক্ত হবে না এটাই স্বাভাবিক। শুধু এটুকুই বলতে পারি, আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে অবহেলা করিনি।
- ➡ আমি সহীহ হাদীস থেকে বর্ণিত ঘটনাগুলো সন্নিবেশিত করতে চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু ঘটনার বিবরণের সনদে হালকা দুর্বলতা রয়েছে (যা সাধারণত সীরাতে বইয়ে থাকে)। কিন্তু এ ধরনের সেই বিবরণগুলোই শুধু উল্লেখ করেছি, যার সমার্থক বিবরণ সহীহ সূত্রে পাওয়া যায় অথবা যা সহীহ বর্ণনার পরিপূরক। এই বইয়ে কোনো জাল বিবরণ উল্লেখ না করার ব্যাপারে আমি সতর্কতা অবলম্বন করেছি।
- ➡ আমি যখন কোনো ঘটনা বর্ণনা করেছি, তখন একটি বিবরণে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিনি; বরং একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন সহীহ বিবরণ একত্র করে সম্পূর্ণ ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। সে কারণে বইয়ের পরিশিষ্ট অধ্যায়ে আমি রেফারেন্সের একটি বিশদ তালিকা যুক্ত করেছি, যার অধিকাংশই হাদীসের কিতাবাদি। এসব কিতাবাদিতে বর্ণিত বিবরণগুলো একত্র করলে আমার বইয়ে বর্ণিত ঘটনাবলির সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। কিছু কিছু ঘটনা একাধিক উৎস থেকে সাহায্য নিয়ে লেখা হয়েছে। (এ কারণে হাদীসের বর্ণনাতত্ত্ব গতানুগতিক ধারা থেকে কিছু ভিন্ন ছিল।)
- ➡ সাহাবীগণের রা. বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি তাদের উক্তি যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে বইয়ে উল্লেখ করতে। কিন্তু সর্বদা এরূপ করতে সক্ষম হইনি। কখনো

সাহাবীদের বর্ণনার আলোকে ঘটনা বিবৃত করেছি। যাতে মূলভাব অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের মানসপটে ফুটে ওঠে। রাসূল ﷺ যখনই কিছু বলেছেন, আমি সর্বদাই তা অবিকল তুলে ধরেছি, কোনো পরিবর্তন করিনি। কখনো আমি সকল বিবরণ একত্রে সন্নিবেশিত করে তুলে ধরেছি। যাতে সম্পূর্ণ চিত্রটি উঠে আসে।

- ➡ আপনারা যারা বইটি পড়বেন তাদের কাছে আমার আবেদন এই যে, আপনারা আমাকে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জানাবেন; হোক তা সংশোধনমূলক বা প্রশংসামূলক। আপনাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমাদের প্রত্যেকেরই উপদেশ-নসীহতের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করব, আমাদের কুরআনে বর্ণিত এই আয়াতটি স্মরণে রাখা উচিত :

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

| “... এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।” *

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নিচের শায়খদের প্রত্যেককে আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা সকলেই আমার এ বইটি প্রাথমিক অবস্থায় পড়ে নিজেদের মূল্যবান অভিমত জানিয়েছেন এবং আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাদের পরামর্শে আমি দারুণভাবে উপকৃত হয়েছি এবং বইতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছি। পাঠক যদি বইটি পড়ে উপকৃত হন, তবে সে অবদান উক্ত লেখকদেরও রয়েছে। তারা হলেন :

- শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনু বায়্যাহ
- ড. সাদ ইবনু আতিয়্যাহ আল ঘামিদী
- ড. আব্দুল ওয়াহহাব আবু সুলায়মান
- ড. আহমাদ বারা' আল আমিরী
- ড. আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল গুসামি
- ড. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান আল সাবা'
- ড. আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল শাকর
- ড. সামি ইবনু আব্দুল আজিজ আল মাজিদ
- ড. আব্দুল্লাহ ইবনু হামাদ আল শাকাকির
- ড. খালিদ ইবনু ফাহাদ আল বাহলুল
- মুহতারাম সালিহ ইবনু হাম্মদ আল ফাওজান
- মুহতারাম জামিল মুহাম্মাদ আল ফারিসী
- মুহতারাম ইয়াসির ইবনু বদর আল হুয়াইমী
- শায়খ মাহমুদ শাবান আব্দুল মাকসুদ

আমি আল্লাহ সুবহানা'হু ওয়াতা'আলা'হা'র কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন তাদের স্বীয়

রহমতের ভান্ডার থেকে অব্যাহত রহমত দান করেন। আমীন।

আব্দুল ওয়াহহাব বিন নাসির আত-তুরাইরি।

মক্কাতুল মুকাররামা।

শুক্রবার, ২০শে আগস্ট, ১৪৩১ হিজরী।

অনুবাদের জীবনবন্দি

বিসমিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মুহাম্মাদ রাসূলিল্লাহ।
আম্মা বা'দ...

আমরা এই বইটি অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি বিধায় আল্লাহর দরবারে
অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। বাংলা ভাষায় যদিও সীরাত-বিষয়ক বেশ কিছু
ভালো মানের বই প্রকাশিত হয়েছে, তবুও এ বইটি সীরাত শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণার
একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দেবে ইনশাআল্লাহ।

সীরাত-বিষয়ক এই বইটির বিশেষত্ব হচ্ছে, এতে নবীজি সারাটি দিন কী কী কাজ
করতেন, অর্থাৎ নবীজির দিনলিপি কীরূপ ছিল, সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা
করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি কঠিন কাজ। বস্তুত, নবীজির জীবনের প্রতিটি দিন
একইরকম কাটেনি। কিন্তু তারপরেও দৈনন্দিন জীবনে তিনি কিছু কাজ করা অব্যাহত
রাখতেন আর সেই কাজগুলোই তাকে অনুপ্রাণিত করত প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত
নতুন উদ্যমে কাজ করতে। সে কাজগুলো কী?

আচ্ছা, আমরা তো সময়-ব্যবস্থাপনার ওপর লেখা অনেক বই পড়ি। আমাদের
দিনলিপিকে কীভাবে আরও কর্মমুখর, ফলদায়ক ও প্রোডাক্টিভ বানানো যায় সে-বিষয়ে
কতশত কর্মশালায় অংশ নিই। অথচ আমাদের নবীজির জীবন থেকেই আমরা এ বিষয়ে
সবচেয়ে ভালো শিক্ষা অর্জন করতে পারি। আল্লাহ তাআলাই তো বলে দিয়েছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“যারা আল্লাহ ও শেষ-দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ
করে, তাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।” ৪

আমরা বইটি অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলাম আজ থেকে বছর দেড়েক আগে। নানা সমস্যায় অনুবাদের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে ১৪৪০ হিজরীর বরকতময় রামাদ্বানের দিনে অনুবাদের কাজ আবার শুরু করি এবং শাওয়াল মাসে অনূদিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের হাতে তুলে দিতে সমর্থ হই। বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক সময়ই ভাবানুবাদের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন পড়েছে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি লেখক যে আবেগ নিয়ে বইটি লিখেছেন, সেই একই আবেগ পাঠকের মাঝেও সঞ্চারিত করতে। আসলে, এই বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমরাও অনেক সময় আবেগাপ্লুত হয়েছি। হারিয়ে গেছি অন্য রকম এক ভুবনে।

লেখক বইয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন অনেকটা গল্পচ্ছলে, যাতে পাঠকের ওপর ভারী না হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তিনি একই বিষয়ে বর্ণিত সকল সহীহ হাদীস একত্র করে ঘটনা বর্ণনা করেছেন নিজের ভাষায়। তবে নবীজি বা সাহাবীর কওল বা উক্তি'র ক্ষেত্রে কোনোরূপ পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন করেননি। বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট অধ্যায়ে লেখক যেসব বইকে সোর্স হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তা উল্লেখ করে দিয়েছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা সব জায়গায় লেখকের লেখনীর মূলানুগ অনুবাদ করিনি। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কথা বিবেচনায় কিছু জায়গায় অতিরিক্ত দুই-একটি শব্দ বা বাক্য সংযোজন করেছি, আবার কোথাও প্রয়োজনের স্বার্থে বিয়োজনও করেছি। তবে সেগুলো নিতান্তই নগণ্য ও স্বল্প। এ কথা সত্য যে, বইয়ে বর্ণিত সব ক'টি কাজ নবীজি ﷺ একই দিনে সম্পন্ন করেননি। আবার বরকতময় নববী জীবনের মাকী অধ্যায়ের সাথে মাদানী অধ্যায়েরও পার্থক্য বিদ্যমান। বইতে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনা নবীজির মাদানী জীবনের, যেহেতু সে সময়েই ইসলাম পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। বই কোনো মূলনীতির আলোকে লেখা হয়েছে এবং কোনো কোন আলেম কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়েছে তা বইয়ের শুরুতে লেখকের কলামে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমরা আশাবাদী, বইটি পাঠ করে পাঠকসমাজ প্রভূত উপকার লাভ করবেন। বইয়ের অনুবাদের সকল ভুলভ্রান্তির দায়ভার আমাদের। এ বই পাঠ করে কেউ উপকৃত হলে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের।

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, তাহিরা আমাতুল্লাহ

১৮ শাওয়াল, ১৪৪০ হিজরী।

সম্পাদিত কথ্য

সীরাত—নববী জীবনের ক্যানভাস। যেখানে সীরাত রচয়িতা মনের মাধুরী মিশিয়ে আঁকেন রাসূলুল্লাহ সা. এর জীবনচিত্র। কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানবের অমলিন স্মৃতিকথা। এটি ধরার বুকে আগত শ্রেষ্ঠ মানবের অনিন্দ্য সুন্দর জীবনচিত্রের এক স্বর্গীয় জলধারা, যেখান থেকে হাজারও নবীপ্রেমিক পান করে ভালোবাসার সুধা।

নবীজির দিনলিপি একটি ব্যতিক্রমধর্মী সীরাত। সাধারণ সীরাতে রাসূল সা. এর জীবনীর ব্যাপ্তি থাকে অনেক বিশাল। এক বছর থেকে আরেক বছরে যেতে যেতে ১০ম হিজরীতে নবীজির মৃত্যুর সময়ে উপনীত হয়ে এর সমাপ্তি ঘটে। কালের এই দীর্ঘ পরিক্রমায় ঘুরতে ঘুরতে পাঠক অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে যান; কিংবা পরের বছরে এসে আগের বছরের জীবনচিত্র ফ্যাকাশে হয়ে যায় তার কাছে।

সময়ের এই প্রলম্বনকে কমিয়ে এনে মাত্র একটি দিনের ভেতর নবীজির জীবনীকে তুলা ধরা হলে পাঠকের জন্য তা হতো চমকপ্রদ ও সহজতম। ভোরের প্রথম প্রহর থেকে রাতের শেষ প্রহরের সামান্য এই সময়টুকুতেই যদি এঁকে ফেলা যায় নবী-জীবনের সামগ্রিক চিত্র, তবে সেটা মনে রাখাও সহজ। চোখ বন্ধ করে কল্পনার ডানায় সওয়ার হয়ে শুধু দিবস-রজনীর এই অল্প সময়ে নবীজির বিস্তার জীবনীর অবলোকন এককথায় অনন্য ও অসাধারণ অনুভূতি এনে দেবে পাঠককে।

সেই চেষ্টা থেকেই রচিত হয়েছে নবীজির দিনলিপি বইটি। এমন অভিনব পদ্ধতিতে এর আগে কোনো সীরাত রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। পাঠক বইটি পড়তে থাকবেন আর তার সামনে একে একে ভেসে উঠতে থাকবে নবীজির একেকটি প্রহরের খণ্ড খণ্ড চিত্র; ঠিক যেভাবে শরতের স্বচ্ছ নীলাকাশে তুলার মতো সাদা সাদা মেঘ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চলতে থাকে আপন মনে।

এই চিত্রগুলো পাঠকের মনকে দোলা দেবে। হৃদয়-সমুদ্রে সৃষ্টি করবে আবেগের ঢেউ।

নবীজির প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে তার অনুভূতির জমীনে। প্রেমময় অনুভবের পেলবতা তাকে মুগ্ধ করে রাখবে দীর্ঘ একটা সময়। তিনি চোখ বন্ধ করে সাঁতার কাটবেন হ্রদের নবীর সরোবরের মিষ্টি জলে।

সীরাতপাঠ প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়। এর অনেকগুলো কারণ আছে। কিছু উল্লেখ করছি :

নবীজি সা. কে গভীর থেকে জানার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে সীরাত-বিষয়ক বই পাঠ করা। যে মহামানব আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ, তাকে যদি জানাই না হয়, তবে তার অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তাই সীরাত পড়তে হয় নবীজিকে জানার জন্য। তাকে চেনার জন্য।

নবীজিকে ভালোবাসা ঈমানের দাবি। কারও ঈমান নবীজির ভালোবাসা ছাড়া কখনো পূরণ হতে পারে না। হাদীসে এসেছে, ‘তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে স্বীয় পিতা, সন্তান ও সকল মানুষ থেকে বেশি প্রিয় না হব।’^৫

এই ভালোবাসা সৃষ্টির জন্যও সীরাত পাঠ করতে হয়। একজন পাঠক নবীজিকে যত বেশি জানবেন, তার চরিত্রসুষমা তাকে তত বেশি মোহিত করবে। সে তত বেশি নবীজিকে আপন করে নেবে। এভাবে ধীরে ধীরে নিজের ঈমানেও পূর্ণতা আসবে।

সঠিক ইসলাম পালনে সহায়ক হওয়ার কারণেও সীরাত পাঠ জরুরি। সীরাত পাঠকের সামনে নবীজির জীবনচিত্র তুলে ধরে। নবী-জীবনী জানার ভেতর দিয়েই তিনি জানতে পারেন ইসলাম কীভাবে মানতে হবে, কীভাবে পালন করতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে, “যারা আল্লাহ ও শেষ-দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।”^৬

সীরাত একজন মুমিনের জীবন চলার পাথেয়। অন্ধকার রাতের আলোকোজ্জ্বল মশাল। সেই মশালের আলোতে মুমিন খুঁজে পায় তার হারানো পথের দিশা। কোথাও দিকহারা হলে সীরাত তার সামনে তুলে ধরে মুক্তির উপায়। কোনো বিপদে পড়লে তার সামনে মেলে ধরে সমাধানের রাস্তা।

[৫] বুখারী : ১৫

[৬] সূরা আল আহযাব, ৩৩:২১

খতীব বাগদাদী রাহ. বলেছেন, ‘রাসূল সা. হলেন সবচেয়ে বড় মানদণ্ড। তাঁর জীবনাচার ও চরিত্রের সামনে সবকিছুকে তুলে ধরতে হবে। তারপর যা কিছু এর সাথে খাপ খাবে সেটাই সত্য হিসেবে বরিত হবে। আর এর বিপরীত যা প্রকাশ পাবে তা বাতিল হিসেবে বিবেচিত হবে।’^৭

সীরাত পাঠে অন্য কোনো উপকার হোক বা না হোক, একটা উপকার হবেই। তা হলো প্রচুর পরিমাণে দরুদ পড়ার সৌভাগ্য লাভ করা। এটি একজন পাঠকের জন্য কত বড় শুভ পরিণাম বয়ে আনবে তা হাশরের ময়দানে বোঝা যাবে। এক হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর হাবীব সা. বলেছেন, ‘কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছাকাছি থাকবে সে সকল লোক, যারা আমার ওপর সবচেয়ে বেশি দরুদ পাঠ করেছে।’^৮

এ ছাড়াও সীরাত অধ্যয়নের আরও নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে। এসব কারণেই উম্মাহর সচেতন আলেমগণ একেবারে শুরুলগ্ন থেকেই সীরাত সংকলন ও রচনায় সচেষ্ট ছিলেন। একেবারে শুরুতে হাদীস ও মাগাযির কিতাবগুলোতে নবী-জীবনী সংকলিত হতো। তারপর ইসলামের ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতেও সীরাত বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এসব কিতাবাদিতে সীরাতের সামগ্রিক বিষয়গুলো সংরক্ষিত হয়ে যাবার পর আলেমগণ ভিন্ন ধারার প্রতি মনোনিবেশ করেন। যেমন : সীরাতের বর্ণনাগুলো থেকে বাছাই করে শুধু সহীহ ও বিশুদ্ধ বর্ণনাসম্বলিত সীরাত রচনা করা। কারণ, প্রথম দিকে আলেমগণ শুধু সনদসহ বর্ণনাগুলো সংকলন করার প্রতি মনোযোগী ছিলেন। এতে সহীহ-যঈফ-মওযু সব ধরনের বিষয়ই স্থান পেত। অনেকে আবার নবী-জীবনের যেকোনো একটি বিষয় নিয়ে সীরাতগ্রন্থ রচনা করেন।। যেমন : রাসূলের আচার-ব্যবহার নিয়ে, কিংবা তাঁর পোশাক-আশাক নিয়ে অথবা তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়ে ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব বিন নাসির আল তুরাইরি রচনা করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্নধারার এই সীরাতটি।

লেখক তাঁর ভূমিকাতে বইটি রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে বলেছেন। আমরা অনূদিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে অবলম্বিত রীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা আরজ করছি। লেখকের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, এই সীরাতে তিনি সহীহ বর্ণনাগুলোই স্থান দিয়েছেন। প্রতিটি ঘটনা কখনো কেবল একটি হাদীস থেকে, আবার কখনো চিত্রকল্প

[৭] আলজামি লি-আখলাকির রাবি : ১/৭৯

[৮] তিরমীযী : ৪৮৪

সংযোজনের স্বার্থে একাধিক হাদীস থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন। ফুটনোটে তিনি এই বিষয়ক বিস্তারিত সূত্রসমূহ উল্লেখ করেছেন। অনূদিত গ্রন্থে আমরা তা যথাসম্ভব পরিহার করেছি। তবে যেসব জায়গায় দু'আর উল্লেখ আছে, সেখানে অবশ্যই সূত্র উল্লেখ করেছি। যাতে সেই দু'আ আমল করার ক্ষেত্রে কারও মনে বিন্দুমাত্র কোনো সংশয় না থাকে। এ ছাড়াও প্রয়োজনবোধে আরও কিছু জায়গাতেও সূত্র উল্লেখ করেছি। সে ক্ষেত্রেও লেখকের উপস্থাপিত একাধিক সূত্র থেকে শুধু এক বা দুইটি সূত্র উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থেকেছি।

মূল লেখক অনেক সময় একাধিক দু'আকে একসাথে উল্লেখ করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ সেজদায় পঠিত অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন দু'আ তিনি একসাথে উল্লেখ করে সবশেষে সবগুলোর সূত্র একসাথে উল্লেখ করেছেন। অনূদিত বইতে আমরা সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন আকারেই পেশ করেছি।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমি আরবী ও ইংরেজি উভয় সংস্করণকেই সামনে রাখতে সচেষ্ট ছিলাম। ইংরেজি অনুবাদটি এই বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণ থেকে করার কারণে অনলাইনে বিদ্যমান এর পুরোনো আরবী সংস্করণ (পিডিএফ) থেকে তাতে কিছু বিষয় অতিরিক্ত পাওয়া যায়। আমরা অনূদিত গ্রন্থেও তা বহাল রেখেছি, যেহেতু ইংরেজি সংস্করণ থেকেই মূলত এটি অনুবাদ করা হয়েছে।

আমরা বইটিকে নিখুঁত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তবুও শতভাগ ত্রুটিহীন হওয়ার দাবি আমরা করছি না। তাই বইটির কোথাও কোনো অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। ইনশাআল্লাহ তা শুধরে নেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বইটিকে কবুল করে নিন। এর সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এর উসিলায় প্রিয় হাবীবের দিদার ও তাঁর মুবারক হাত থেকে হাশরের মাঠে হাউজে কাউসারের পানি পান করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

জিলকদ ১৪৪০, জুলাই ২০১৯

তৃত্বিকা

মদীনা খেজুর বৃক্ষময় এক নগরী। এ শহর প্রাণবন্ত একদল জান্নাতীদের শহর। এই সেই শহর যেখানে স্থায়ী আবাস গেড়েছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। এখানেই ছিল মুহাম্মাদ ﷺ এর হৃদয়। এটি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শহর। এখানের প্রতিটি অলি-গলি, রাস্তাঘাট আর মানুষজন তাঁর আপন।

নবীজি ﷺ-এর আগমানে এ শহর নবজীবন লাভ করেছিল। এ শহরের স্বাভাবিক প্রকৃতি তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিল। এ শহরবাসীও তাকে ভালোবেসেছিল। এই তো সেই উহুদ পর্বত, যে পর্বত পর্যন্ত তাঁকে আপন করে নিয়েছিল; তিনিও আপন করে নিয়েছিলেন এই পর্বতকে। এই শহরের প্রতিটি সরু অলিগলিও তার পদচিহ্ন চিনতে সক্ষম।

এখানেই আছে প্রিয় নবী ﷺ-এর মসজিদ, মসজিদে নববী। মসজিদের পাশেই ছিল তাঁর ছোট ঘর। এই মসজিদেই জমায়েত ঘটেছিল একদল অসাধারণ মানুষের, যারা তাদের রাসূলকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করত, তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করত। তারাই হলেন সাহাবা রাঃদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদ্দীন! তাদের সাথে রাসূলের ছিল স্নেহ-ভালোবাসা মেশানো মায়াবী এক সম্পর্ক। তারা সব সময় তাদের প্রিয় রাসূল ﷺ-এর চারপাশ ঘিরে থাকতেন। রাসূল তাদের ভালোবাসতেন মনের গহিন থেকে। তা ছাড়া আল্লাহর সাথে তো তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিলই। *

আমরা এ বইয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর একটি দিনের কর্মব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করব। একটি সাধারণ দিনে রাসূল ﷺ-এর প্রত্যেকটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি ঘণ্টা কীভাবে অতিবাহিত হতো, তা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করব। এর ফলে আমরা রাসূল ﷺ-এর অনাড়ম্বর জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

[৯] রাসূলের সাথে ছিল আল্লাহর বিশেষ সম্পর্ক। আল্লাহপাক আমাদের সর্বদা রাসূলকে ﷺ অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। তাই তো সাহাবী রাঃদিয়াল্লাহু আজমাদ্দীন প্রতি মুহূর্তে রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করতেন।

আমরা অনুধাবন করতে পারব, রাসূল ﷺ কীভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যেকটি কাজের মাঝে পরিপূর্ণ সমতা বজায় রাখতেন, কীভাবে দ্বীনি-দুনিয়াবি চাহিদা ও দায়িত্ব সুস্থভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হতেন।

রাসূল ﷺ-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল প্রাণোচ্ছল। একটি সেকেন্ডও অপচয় হতো না। প্রতিটি মুহূর্তেই জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে বোঝাপড়া করতেন, সমস্যার সমাধান করতেন, দায়িত্ব সম্পন্ন করতেন। গৃহে কিংবা মসজিদে, মদীনার গলিতে কিংবা প্রিয় সাহাবীদের গৃহে; এমনকি খাদ্য গ্রহণের সময় অথবা ঘুমানোর প্রস্তুতিকালে—সর্বদাই তিনি থাকতেন কর্মমুখর।

রাসূল ﷺ-কে সর্বদা অনুসরণ করতেন তাঁরই প্রিয় সাহাবীগণ। রাসূলের মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি শব্দ; এমনকি তাঁর সূক্ষ্ম গতিবিধি পর্যন্তও তাদের নজর এড়াত না। রাতের অন্ধকারের সাধ্য ছিল না রাসূলপ্রেমী এই সাহাবীদের স্নেহাশিস অন্তরগুলো আটকানোর। তারা তো এমনকি এটি জানার জন্যেও উদগ্রীব থাকতেন যে, আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ কীভাবে রাত কাটান!

এমন কোনো উচ্চ দেয়াল নেই, যা তাঁর ব্যক্তিজীবনকে ঢেকে রাখতে পারে।^{১০} কিছু আলোকিত অন্তর এবং দীপ্ত চক্ষু সর্বদাই রাসূল ﷺ-কে নজরে রাখত, যতক্ষণ না তিনি ঘুমোতে যেতেন। এমনকি যখন রাসূল ﷺ ঘুমিয়ে পড়তেন কিংবা ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখনো তারা তাদের প্রিয় রাসূলকে পর্যবেক্ষণ করতেন।

রাসূল ﷺ আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না। একজন সাধারণ ব্যক্তি হয়তো সকালে খুবই প্রাণোচ্ছলতার সাথে দিন শুরু করতে পারে, কিন্তু দিনের শেষে সন্ধ্যা নামতেই সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সমগ্র দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্তে রাসূল ﷺ-এর মাঝে কর্মশক্তির এত অনাবিল অমিয় প্রবাহ বিরাজ করত যে, আপনি অনুভব করবেন, সমগ্র দিনের প্রত্যেক মুহূর্তই যেন ছিল তাঁর জন্যে এক নতুন সূচনা।

রাসূল ﷺ কোনো মুহূর্ত অপচয় করতেন না, কোনো সুযোগকে হেলায় হারাতেন না। তিনি সহজাতভাবেই অনুভব করতেন যে, আল্লাহর নবী ও রাসূল হিসেবে প্রতিটি কাজের ও মুহূর্তের হিসাব তাকে দিতে হবে; জবাবদিহি করতে হবে। তাই তো তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ঘণ্টা ছিল কর্মমুখর ও সাফল্যমণ্ডিত। আর এভাবেই

[১০] রাসূলের প্রিয় সহধর্মিণী, আমাদের উম্মাতুল মুমিনীনগণও সর্বদা গৃহে রাসূলের ﷺ কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতেন। আর তাই কোন দেয়ালই এত উচ্চ ছিলনা যে, রাসূলের অনিন্দ্য সুন্দর ব্যক্তিজীবনকে গোপন করতে পারে।

তিনি হয়েছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সফলতম ব্যক্তি।

এই বইয়ে আমরা কল্পনায় রাসূলের সাথে একটি দিন কাটাব, দিনে এবং রাতে, সর্বক্ষণ। আমরা রাসূলের সাথে মদীনার রাস্তায় হাঁটব। আমরা তাঁর স্নেহভরা কণ্ঠ শুনব যখন তিনি প্রিয় সাহাবীদের দ্বীন শিক্ষা দিতেন। আরও শুনব তাঁর বিনম্র তিলাওয়াত, যখন তিনি বিনয়াবনত হয়ে সালাতে নিমগ্ন থাকতেন। আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে তার শক্ত মাদুরে বসব এবং তিনি সামান্য পরিমাণ যে খাবারটুকু গ্রহণ করতেন তা থেকেও আমরা খাব। কারণ, রাসূল ﷺ হাসিমুখে অপরের সাথে খাবার ভাগ করতে সব সময় প্রস্তুত থাকতেন।

সাহাবীদের থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা অনুসরণ করে আপনি কল্পনায় রাসূল ﷺ-এর গৃহে চলে যেতে পারেন। আপনি দেখতে পারেন, কীভাবে রাসূল ﷺ প্রশান্তচিত্তে ঘুমোতেন আর কীভাবে তিনি পরিপূর্ণ কর্মতৎপরতায় প্রত্যেকটি কাজ সম্পন্ন করতেন। আপনি হয়তো ছোট্ট কোনো শিশুকে কোলে নিয়ে রাসূল ﷺ-কে বসে থাকতে দেখবেন অথবা ছোট্ট কোনো বাচ্চাকে কাঁধে বহনরত অবস্থায় তাকে খুঁজে পাবেন। এমনকি শিশুরাও রাসূল ﷺ-এর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হারাত না। শত-কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি!

প্রশ্ন জাগে, শ্রেষ্ঠ মানব ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ ﷺ কীভাবে নিজের মানবিক চরিত্র ও আল্লাহর রাসূল হিসেবে তাঁর যে দায়িত্ব আছে—এই উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বজায় রাখতেন? জীবনের দৈনন্দিন কার্যাবলি কীভাবে সম্পাদন করতেন? সমগ্র দিন কীভাবে অতিবাহিত করতেন?

আসুন, আমরা একসাথে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। কীভাবে এই মহামানব দিন কাটাতেন? যিনি একাধারে ছিলেন একজন নবী, আল্লাহর বার্তাবাহক, নেতা, পিতা, স্বামী এবং বন্ধু। আমরা এই বইয়ে সেই চেষ্টাটিই করব।

দিনের প্রথম প্রহর

রাতের অন্ধকার চিরে ভোরের প্রথম আলো সবেমাত্র ফুটে উঠেছে। সুবহে সাদিকের এমন মুহূর্তেই বিলাল রা.-এর দরাজ গলা মদীনায় রাতের নীরবতা ভেঙে দিল। তিনি সুমধুর কণ্ঠে ফজরের আযান দিচ্ছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই সময়টাতে ঘুমিয়ে আছেন, দীর্ঘরাত্রি নফল নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার পর হালকা বিশ্রাম নিচ্ছেন। বিলাল রা.-এর আযান শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ জাগ্রত হলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি প্রথম যে কাজটি করতেন তা হলো, তিনি মিসওয়াক হাতে নিয়ে দাঁত মাজতেন। তারপর বলতেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

অর্থ : ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাদের জীবিত করলেন, আর তাঁরই নিকট সকলের পুনরুত্থান।’^{১১}

অতঃপর রাসূল ﷺ আযানের জবাব দিতেন। মুয়াজ্জিন যখন বলতেন, ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’—আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ!, সে সময় তিনিও একই কথা উচ্চারণ করতেন।

যখন মুয়াজ্জিন বলতেন, ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তখন নবী ﷺ বলতেন ‘ওয়া আনা’—আমিও (একই সাক্ষ্য) দিচ্ছি।

মুয়াজ্জিন যখন বলতেন, ‘আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও আগের মতো অনুরূপভাবে একই সাক্ষ্য দিতেন।

[১১] বুখারী ফাতহুল বারী ১১/১১৩, নং ৬৩১৪; মুসলিম ৪/২০৮৩, নং ২৭১১

[১২] রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুকে ঘুমের সাথে তুলনা করতেন। তিনি বলতেন, ‘ওয়াল্লাহি, তোমরা মৃত্যুবরণ করবে, ঠিক যেভাবে তোমরা ঘুমাও। আর তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে, ঠিক যেভাবে তোমরা (ঘুম থেকে) জাগ্রত হও।’

মুয়াজ্জিন যখন মানুষকে আহ্বান জানিয়ে বলতেন, ‘হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ’—সালাতের দিকে আসো, কল্যাণের দিকে আসো, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রত্যেকবার বলতেন ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’—মহান আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা ছাড়া আর কোনো আশ্রয় ও সাহায্য-ক্ষমতা নেই। এভাবে তিনি মুয়াজ্জিনের কথার পুনরাবৃত্তি করে আযানের বাকি অংশেরও জবাব দিতেন।

আযানের পরে তিনি ﷺ দুআ করতেন এই বলে :

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الثَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ، إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ.

অর্থ : ‘হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের তুমিই রব। মুহাম্মাদ ﷺ-কে দান করো ‘অসীলা’ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা। আর তাঁকে মাকামে মাহমুদ তথা সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দাও, যার ওয়াদা তুমি তাঁকে দিয়েছ। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।’ ১০

অতঃপর নবী ﷺ উঠে বসতেন। গোসলের প্রয়োজন হলে তিনি গোসল সারতেন আর উযুর প্রয়োজন হলে উযু করে নিতেন। মাঝে মাঝে তিনি উযু না করেই সালাতে রওনা হতেন। কেউ হয়তো তাকে প্রশ্ন করত, এ রকম করা ঠিক কি না? তার উত্তর ছিল, ‘আমার চক্ষু শুধু ঘুমায়, কিন্তু অন্তর সদা জাগ্রত থাকে।’ ১১

তারপর তিনি ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত সালাত আদায় করতেন। তিনি এই দুই রাকাত সালাত খুবই দ্রুততার সাথে আদায় করতেন, যা অন্য ওয়াক্তের সালাতের বেলায় সচরাচর দেখা যেত না। তিনি সাধারণত সূরা ফাতিহার পর প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন পড়তেন। আর দ্বিতীয় রাকাতে পড়তেন সূরা ইখলাস।

তা ছাড়া মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার ১৩৬ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন :

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

[১০] সহীহ বুখারী, ১-২৫২; বায়হাকী, ১-৪১০

[১১] মুসনাদে আহমদ : ১৯১১, ২৪০৭৩; সহীহ বুখারী : ১১৪৭, ২০১৩

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

অর্থ : তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের ওপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।^{১৫}

আর দ্বিতীয় রাকাতে তিলাওয়াত করতেন সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতটি :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অর্থ : বলুন, ‘হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা এমন একটি কথার দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোনো শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাকো—আমরা তো অনুগত।^{১৬}

অনেক সময় সূরা আল-ইমরানের ৫২ ও ৫৩ নং আয়াতও তিলাওয়াত করতেন :

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অর্থ : অতঃপর ঈসা (আ.) যখন বনি-ঈসরাঈলের কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী-সাথিরা বলল, আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি। হে আমাদের

[১৫] সূরা আল বাকারা, ২:১৩৬

[১৬] সূরা আল ইমরান, ৩:৬৪

পালনকর্তা, আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব আমাদের মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।^{১৭}

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের এই দুই রাকাত সুন্নাহ সালাত অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগের সাথে আদায় করতেন। তিনি বলতেন, ‘দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সেসব কিছু হতেও এই দুই রাকাত সুন্নত সালাত আমার নিকট অধিক মূল্যবান।’

ফজরের সুন্নত সালাত আদায়ের পর রাসূল ﷺ যদি স্বীয় পত্নীকে জাগ্রত অবস্থায় পেতেন তবে তিনি তাঁর সাথে প্রীতি ও ভালোবাসার আলাপচারিতা করতেন। এমন একজন স্ত্রী কতই-না সুখী, যার দিন শুরু হয় আপন স্বামীর সাথে প্রেমময় আলাপনের মধ্য দিয়ে! যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী তখনো ঘুমিয়ে থাকতেন, তবে তিনি ﷺ ফরজ সালাতের আগ পর্যন্ত ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন।

জামাতের সময় ঘনিয়ে এলে বিলাল রা. নবীজি ﷺ-এর কক্ষের নিকটে এসে ডাক দিয়ে বলতেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, সালাতের সময় হয়েছে।’ তখন নবীজি ﷺ সালাত পড়ানোর জন্য বেরিয়ে আসতেন। তিনি যখন তাঁর কক্ষ থেকে বের হতেন, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন,

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلِمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

অর্থ : “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট পথভ্রষ্ট হওয়া বা পথভ্রষ্ট করা, পদস্থলিত হওয়া বা পদস্থলিত করা, উৎপীড়ন করা বা উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”^{১৮}

মসজিদে প্রবেশ করার পর বলতেন,

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ : শুরু করছি আল্লাহর নামে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর নবীর ওপর। হে আমার রব, আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আপনি আমার

[১৭] সূরা আল ইমরান, ৩:৫২,৫৩

[১৮] সুনানে আবু দাউদ : ৫০৯৪; জামে তিরমিযী : ৩৪২৭; সুনানে ইবনু মাজাহ : ৩৮৮৪।

জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।^{১৯}

যখন বিলাল রা. নবীজিকে ﷺ মসজিদে প্রবেশ করতে দেখতেন, তখন তিনি সালাতের ইকামাত দিতেন আর সাহাবীগণও (রাব্বিয়াল্লাহু আজমাইন) কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন।

রাসূল ﷺ যখন সালাতের জন্য বেরিয়ে আসতেন, তখন হয়তো তার মাথা থেকে গোসলের পানি ঝরতে দেখা যেত। এমনও হয়েছে যে, ইকামাত ঘোষিত হয়ে গেছে, সাহাবীগণও রা. সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেছেন আর নবীজি ﷺ-ও সালাতের জন্য বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট স্থানে ইমামতির জন্য দাঁড়ালেন; এমন সময় তাঁর স্মরণ হলো যে, তিনি জানাবাতের হালতে আছেন।^{২০}

রাসূল ﷺ তখন হাত দিয়ে সাহাবীদের রা. ইশারা করতেন থামার জন্য আর বলতেন, ‘তোমরা স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকো।’ অতঃপর তিনি নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি গোসল সেরে বেরিয়ে আসতেন। সে সময় তার মাথা বেয়ে গোসলের পানি গড়িয়ে পড়ত।^{২১}

নবীজী ﷺ না এসব ব্যাপার লুকোতেন, না তিনি লজ্জাবোধ করতেন। তিনিও তো একজন মানুষ ছিলেন, যার জীবনে মানবীয় সব দিকের প্রতিফলন ছিল। ঠিক যেমনটি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا

অর্থ : যদি আমি কোনো ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হতো।^{২২}

রাসূল ﷺ যখন নামাজে দাঁড়াতেন, তখন পেছনের মুসল্লীগণ সারিবদ্ধভাবে সোজা

[১৯] সুনানে আবু দাউদ : ৪৬৫; জামে তিরমিযী : ৩১৪

[২০] ‘জানাবাত’ হচ্ছে বড় নাপাকির নাম। মূলত নাপাকি দুই ধরনের। জানাবাত আকবার বা বড় নাপাকি এবং জানাবাত আসগার বা ছোট নাপাকি। বড় নাপাকি বলতে বুঝানো হয় এমন অপবিত্র অবস্থাকে, যাকে যাকে দূর করার জন্য গোসল করার প্রয়োজন পড়ে। এই নাপাকি সৃষ্টির একটি কারণ হলো স্ত্রী-সহবাস করা। এমন নাপাকির হালতে থাকলে সালাত আদায়ের আগে অবশ্যই ফরজ গোসল করে নিতে হয়। আর ছোট নাপাকি বলতে বুঝানো হয় এমন অপবিত্র অবস্থাকে, যাকে দূর করার জন্য গোসলের প্রয়োজন হয় না। বরং অজু করে নেওয়ার দ্বারাই এই নাপাকি দূর হয়ে একজন ব্যক্তি সালাত আদায়ের জন্য পবিত্র হয়ে যায়। – সম্পাদক

[২১] মুসনাদ আহমদ : ৭২৩৮, ৭৮০৪

[২২] সূরা আল আনআম, ৬:৯

কাতারে দাঁড়িয়েছেন কি না তা প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিতেন। তিনি বলতেন, ‘কাতার সোজা করো এবং একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াও। কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অংশ।’ ২০ অতঃপর নবীজি ﷺ ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলে সালাত শুরু করতেন। তারপর তিনি বাম হাতের ওপর ডান হাত রেখে নামাজে দাঁড়াতে আর নিঃশব্দে নিম্নোক্ত দুআটি করতেন :

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ
اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আমার এবং আমার গুনাহসমূহের মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করুন, যে রূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আমার পাপসমূহ বরফ, পানি ও মেঘের শিলাখণ্ড দ্বারা ধৌত করে দিন। ২১

তারপর রাসূল ﷺ সশব্দে কুরআনের প্রথম সূরা তথা সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের মাধ্যমে সালাত শুরু করতেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করতেন এবং সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াত তিলাওয়াতের পর থামতেন। সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর তিনি কুরআনের যেকোনো অংশ থেকে তিলাওয়াত করতেন। প্রথম রাকাতের চেয়ে দ্বিতীয় রাকাতের তিলাওয়াত তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত হতো। তিনি এই দুই রাকাতে সব মিলিয়ে প্রায় ৬০ থেকে ১০০ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন। ফজরের সময় কুরআন তিলাওয়াত করার যে নির্দেশ কুরআনে দেয়া হয়েছে সেদিকে লক্ষ রেখেই রাসূল ﷺ এমনটি করতেন। আল্লাহ বলেন :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

অর্থ : সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কয়েম করুন এবং

[২০] মুসনাদ আহমদ : ১২০১১, সহীহ বুখারী : ৭১৯

[২১] মুসনাদ আহমদ : ৭১৬৪; সহীহ বুখারী : ৭৪৪; আবু দাউদ : ৭৮১

ফজরের কোরআন পাঠও (চালু রাখুন)। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠে (ফেরেশতারা) উপস্থিত হয়।*

জুমার দিন রাসূল ﷺ সাধারণত ফজরের ফরয সালাতের প্রথম রাকাতে সূরা আস-সাজদাহ আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল-ইনসান পাঠ করতেন।

যখন মুসলিম উম্মাহ কোনো কঠিন পরীক্ষা বা দুর্যোগের মুখোমুখি হতো, তখন প্রিয় নবী ﷺ দ্বিতীয় রাকাতে উম্মতের জন্য দুআ করতেন। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, যাতে আল্লাহ অশান্তি কাটিয়ে দেন এবং মুসলিম উম্মাহকে প্রশান্তি ও বিজয় দান করেন। কবি আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহ রা., যিনি একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন, তিনি এই দৃশ্য কাব্যের ভাষায় লেখেন,

“আমাদের মাঝে আছেন আল্লাহরই রাসূল,
যেন ভোরের আঁধার নির্মূল করে দেয়া এক উজ্জ্বল আলো,
তিনি আমাদের পড়ে শোনান আল্লাহরই কিতাব।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ হয়ে গেলে কিবলামুখী হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকতেন, আর দুআ করতেন :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (আস্তাগফিরুল্লাহ, ৩ বার)। হে আল্লাহ, আপনি শান্তিময়। আপনার নিকট থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়। আপনি বরকতময়, হে মহিমাময় ও সম্মানের অধিকারী।*

তারপর তিনি ﷺ ডান পাশে ফিরে (মাঝে মাঝে বাম পাশেও ফিরে) বসতেন। তিনি যখন সাহাবীদের দিকে ফিরে বসতেন, তখন সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-কে প্রথম যে কথা বলতে শুনতেন তা হলো : “হে আমার রব, যেদিন আপনি আপনার দাসদের পুনরুত্থিত করবেন, সেদিনের আযাব থেকে আমি পরিত্রাণ চাই।”

তারপর তিনি যিকিরে মশগুল হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন,

[২৫] সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৭৮

[২৬] মুসনাদ আহমদ : ২২৪০৮; ইবনু মাজাহ : ৯২৮

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই। তার কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তারই। সমস্ত প্রশংসাও তার। আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করেছেন তা বন্ধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রুদ্ধ করেছেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আর কোনো ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আপনার কাছে কোনো উপকারে আসবে না।^{২৭}

তারপর তিনি স্বাভাবিক নিয়মে ‘সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার’ পড়ে সকালের যিকির শুরু করতেন। তিনি কখনো বলতেন :

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ (أَمْسَيْنَا وَ أَمْسَى) الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ (هَذِهِ اللَّيْلَةِ) وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ (بَعْدَهَا)،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ (هَذِهِ اللَّيْلَةِ) وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ (بَعْدَهَا)،
رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي
النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

অর্থ : আমরা আল্লাহর জন্য সকালে উপনীত হয়েছি। অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও সকালে উপনীত হয়েছে আল্লাহর জন্য। সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তার কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তারই এবং প্রশংসাও তার। আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে রব, এই দিনের মাঝে এবং তার পরে যা কিছু কল্যাণ আছে আমি তা আপনার নিকট প্রার্থনা করি। আর এই দিনের মাঝে যা কিছু অকল্যাণ আছে, তা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই। হে রব, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা ও খারাপ বার্ধক্য থেকে। হে রব, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব হওয়া থেকে এবং কবরের আযাব হওয়া থেকে। ✽

[২৭] মুসনাদ আহমদ : ১৮১৫৮; আবু দাউদ : ১৫০৫

[২৮] মুসনাদ আহমদ : ৪১৯২

তিনি একই দুআ বিকালেও করতেন, শুধু দুআয় ‘সকাল’-এর জায়গায় ‘বিকাল’ শব্দ যুক্ত হতো।

প্রিয়নবী ﷺ সকাল-সন্ধ্যায় একটি দুআ করতে ভুলতেন না। দুআটি হলো :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْئُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ
رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ
شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং নিরাপত্তা চাচ্ছি আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও অর্থ-সম্পদের। হে আল্লাহ, আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্ভিগতাকে রূপান্তরিত করুন নিরাপত্তায়। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে হেফাযত করুন আমার সামনে থেকে, আমার পেছন থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার ওপরের দিক থেকে। আর আপনার মহত্ত্বের উসিলায় আশ্রয় চাই আমার নীচ থেকে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে।

তিনি সকাল-সন্ধ্যায় নিচের দুআটি তিনবার করতেন,

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শরীরে। হে আল্লাহ, আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শ্রবণশক্তিতে। হে আল্লাহ, আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কুফর ও দারিদ্র্য থেকে। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই।

ভোরের এই স্নিগ্ধ সময়টাতে সম্পূর্ণ মদীনার লোকজন পানিভর্তি পাত্র নিয়ে নবীজি

ﷺ-এর কাছে আসত। তারা তাকে অনুরোধ করত, যাতে তিনি পানিতে নিজের বরকতময় হাত ডুবিয়ে দুআ করে দেন আর এর দ্বারা তারা বরকত লাভ করতে পারে। মাঝে মাঝে যখন তীব্র শীতের সকালে পাত্র হাজির করা হতো, তখনো নবীজি ﷺ হাসিমুখে প্রত্যেক পানির পাত্রেই হাত ডুবিয়ে দিতেন।

দৃশ্যটা খুবই মনোরম ছিল—নবীজি ﷺ হাসিমুখে ছোট বাচ্চাদের কচি কচি হাতের দিকে তাকাতেন। নিষ্পাপ বাচ্চারাও রাসূল ﷺ-এর কাছে বরকত চাইত। একটু দূর থেকে তাদের প্রিয় পিতামাতা হাসিমুখে দৃশ্যটি অবলোকন করতেন। বাচ্চারা পানিভর্তি পাত্র নিয়ে এগিয়ে যেত আর নবীজি হাসিমুখে পাত্রে হাত ডুবিয়ে দিতেন। এভাবে বাচ্চাদের অন্তরে নবীজি ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা শিকড় গেড়ে নিত। কত সুখীই-না ছিল তাদের মুখখানা, যারা তাদের দিনের শুরু করত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসিমুখ দেখে!

সাত-সকালে নবীর সাথে

ফজরের সালাত আর সকালের আযকার (মাসনুন দুয়া) শেষ হয়ে যাওয়ার পর সাহাবীদের সারিগুলো কাছাকাছি হয়ে যেত। তারা সবাই নবী ﷺ-এর চারপাশে জড়ো হয়ে বসে পড়তেন। নবীজি ﷺ তখনো সালাতের স্থানে বসে সকল সাহাবীদের দেখতেন। ভোরের আলো তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দিত। তাঁর হাসিমাখা দীপ্তিমান চেহারা দেখে মনে হতো যেন সূর্য তাঁর মুখে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে যে কেউই বুঝে ফেলত, এই চেহারা একজন সত্যবাদী মানুষের চেহারা।

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রা. বলেন, “আমি যখন নবীজি ﷺ-এর চেহারা পর্যবেক্ষণ করলাম, তখন আমি বুঝতে পারলাম, এই চেহারা মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়।”

নবীজি ﷺ প্রায়ই নাসীহাহর (সদুপদেশের) মাধ্যমে কথা বলা শুরু করতেন। ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ রা. হতে বর্ণিত, “একদিন ফজরের সালাতের পর নবীজি ﷺ আমাদের খুবই আবেগময় নাসীহাহ দিচ্ছিলেন। ফলে লোকদের চক্ষু বেয়ে অবিরত অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।

কেউ একজন বলল, “হে আল্লাহর রাসূল, এটি তো মনে হচ্ছে কারও বিদায়বেলা দেয়া নাসীহাহ। আপনি আমাদের কী করতে আদেশ করেন?”

উত্তরে নবীজি ﷺ বললেন, ‘আমি তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের এবং আমীরের নির্দেশ শোনার ও মানার অসিয়ত করছি; এমনকি সে যদি আবিসিনীয় কালো দাসও হয় তবু। স্মরণ রাখবে, তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে। তোমরা ভ্রান্ত জিনিস থেকে সাবধান থাকবে। কারণ, তা তোমাদের পথভ্রষ্ট করে দেবে। সে সময় তোমাদের কর্তব্য হলো আমার সুন্নত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ করা। তোমরা একে মজবুতভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে

আঁকড়ে ধরে থেকো।” ৩০

আদর্শ শিক্ষক নবীজি ﷺ খুব ঘনঘন এ রকম নাসীহাহ দিতেন না; বরং তিনি তাদের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখতেন। যাতে করে তারা বিরক্ত না হন।

যখন সাহাবীগণ নবীজি ﷺ-এর চারপাশে জড়ো হতেন, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করতেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কি অসুস্থ আছে, যাকে আমি গিয়ে দেখে আসতে পারি?”

সাহাবীদের উত্তর না-বাচক হলে তিনি হয়তো জিজ্ঞেস করতেন, “কোনো জানাযা আছে নাকি, যেটিতে আমি অংশ নিতে পারি?”

কোনো সাহাবী উপস্থিত না থাকলে নবীজি ﷺ সেই সাহাবীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন। এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা মসজিদ পরিষ্কার করত। নবীজি ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে একদিন তার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তখন তাকে জানানো হলো যে, সে তো মারা গেছে। নবীজি ﷺ অনুযোগ করে বললেন, “তোমরা আমাকে কেন জানালে না!” সাহাবীগণ ভেবেছিলেন ওই মহিলার মারা যাওয়ার খবর রাসূল ﷺ-কে সাথে সাথে জানাবার মতো জরুরি কিছু ছিল না। তারা বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে রাতে মারা গিয়েছিল এবং রাতেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। আমরা চাইনি আপনাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে।” নবীজি ﷺ তখন সাহাবীদের নির্দেশ দেন মহিলার কবরস্থান দেখিয়ে দিতে। তারপর তিনি কবরস্থানে যান, জানাযার নামায আদায় করেন এবং মরহুমার জন্যে দুআ করেন।

একবার নবীজি ﷺ খেয়াল করলেন সাবিত ইবনু কায়েস ইবনু শাম্মাস রা.-কে দেখা যাচ্ছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা সাবিত ইবনু কায়েসকে দেখছি না কেন? সে কি অসুস্থ?”

সাদ ইবনু মুয়াজ রা. বলেন, “সে আমার প্রতিবেশী আর তার অসুস্থতার ব্যাপারে কোনো সংবাদ আমি শুনিনি।”

সাদ রা. তাকে দেখতে গিয়ে দেখেন যে, তিনি নিজ বাসায় দরজা বন্ধ করে কাঁদছেন। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে সাবিত রা. বললেন, “আল্লাহ বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

‘মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বোলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।’ ৩১

আমার কণ্ঠস্বর উঁচু। আমার তো ভয় হয়, আমার সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে আর আমি জাহান্নামে পতিত হব।”

এ কথা যখন নবীজি ﷺ-এর কানে গেল তখন তিনি তাঁকে বললেন, “না না, তুমি সোঁসব লোকদের মতো নও। তোমার জীবন ও মরণ উভয়ই কল্যাণকর। আর তুমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই সাহাবীদের খোঁজখবর রাখতেন, কাউকেই ভুলে যেতেন না। রাসূল ﷺ-এর কাছে প্রত্যেকেরই আলাদা মর্যাদা ছিল। রাসূলের সাথে যিনিই সাক্ষাৎ করতে আসতেন তাকেই তিনি সাদরে, যত্নের সাথে গ্রহণ করতেন। কেউ অনুপস্থিত থাকলে তাকে ভুলে যেতেন না; বরং তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। সে ব্যক্তি সুস্থ আছে কি না সেই বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ধরনের নববী আচরণ সামাজিক বন্ধন ধরে রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের আচরণের ফলেই সমাজের প্রত্যেক সদস্য দৃঢ়ভাবে অনুভব করে যে, সে নিজে এই সম্প্রদায়ের অংশভুক্ত। সাত-সকালের এই সময়টাতে নবীজি ﷺ কখনো কখনো সাহাবীদের কাছে তাদের স্বপ্নের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। তিনি ﷺ বলতেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো স্বপ্ন দেখে থাকলে আমাকে বলতে পার, আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেব।” সাহাবীগণ তাদের স্বপ্নের বর্ণনা দিতেন আর নবীজি ﷺ সেই স্বপ্নের তাবীর করে দিতেন অথবা এই সময়টাতে সাহাবীদের উপকারী কথা শিক্ষা দিতেন।

উদাহরণস্বরূপ আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন,

“নবীজি ﷺ জীবিত থাকতে একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি চমৎকার ও বিশাল বাগানে আছি। বাগানের মাঝে একটি স্তম্ভ। স্তম্ভটি নীচের দিকে মাটির গভীরে আর তার ওপরিভাগ আকাশে পৌঁছে গেছে। স্তম্ভের ওপরিভাগে একটি হাতল। তখন

আমাকে বলা হলো, ওপরের দিকে ওঠো। আমি বললাম, পারছি না। তখন আমার কাছে একজন খাদেম আসল এবং আমার কাপড় গুটিয়ে দিল। আমি ওপরের দিকে উঠতে উঠতে হাতলটি ধরে ফেললাম। আমাকে বলা হলো হাতলটি যাতে শক্ত করে ধরে রাখি। হাতলটি ধরে থাকা অবস্থায় আমি ঘুম থেকে জেগে গেলাম, মনে হচ্ছিল তখনো তা ধরে আছি।

তারপর এ স্বপ্ন নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, ‘ওই বাগান ইসলামের বাগান, ওই স্তম্ভ ইসলামের স্তম্ভ, আর ওই হাতল হলো মজবুত হাতল। তুমি মৃত্যু অবধি ইসলামকে শক্তভাবে ধরে থাকবো।’” ৩২

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রা. ছিলেন একজন প্রাক্তন ইহুদী র্যাবাই (ধর্মযাজক)। নবীজি ﷺ মদীনায়ে হিজরত করার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রা. প্রায় ৩৫ বছর বেঁচে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে আরবের অনেক গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ করে, যা ‘স্বধর্মত্যাগীদের যুদ্ধ’ নামে ইসলামের ইতিহাসে পরিচিত। আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রা. সেই ঝগড়াবিস্কন্ধ সময়েও ইসলামের বন্ধন দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ছিলেন, ঠিক যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। আমৃত্যু তিনি এভাবেই দৃঢ়ভাবে ইসলামের ওপর অবিচল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন তা এদিকেই ইশারা দেয় যে, তার ﷺ ওফাতের পর ধর্মত্যাগের হিড়িক পরে যাবে, কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রা. মুরতাদদের সাথে যোগ দেবেন না। এই ঘটনাটিও রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াতের নিদর্শন প্রমাণ করে।

আরেকদিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের কাছে জানতে চাইলেন কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছে কি না, যাতে তিনি সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে পারেন। এক ব্যক্তি বলল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আজ রাতে স্বপ্নে একটি ছায়াদার মেঘ দেখেছি, যা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘি ও মধু পড়ছিল। লোকদের দেখলাম তারা হাতে তুলে নিয়ে তা পান করছে। কেউ বেশি পাচ্ছে এবং কেউ কম পাচ্ছে। আমি আরও দেখলাম আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত একটি রশি ঝুলছে। আমি দেখলাম আপনি তা ধরে ওপরে উঠে গেছেন। আপনার পর আরেকজন তা ধরে ওপরে উঠে গেল, তার পরে আরেকজন তা ধরে ওপরে উঠে গেল। তার পরে আরেকজন তা ধরলে রশিটি ছিঁড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া

লেগে গেল এবং সেও তা ধরে ওপরে উঠে গেল।”

আবু বকর রা. বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে দিন।”

রাসূল বললেন, “আচ্ছা, তুমি এর ব্যাখ্যা করো।”

আবু বকর রা. বললেন, “মেঘখণ্ড হলো ইসলামের ছায়া। পতিত ঘি ও মধু হলো কুরআনের মাধুর্য ও কোমলতা। আর (সেখান থেকে) গ্রহণকারীরা হলো কুরআন থেকে বেশি ও কম লাভকারী। আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশি হলো সেই মহাসত্য, যার ওপর আপনি প্রতিষ্ঠিত। আপনি রশিটি ধরলেন এবং আল্লাহ আপনাকে ওপরে উঠিয়ে নিলেন। আপনার পর তা আরেকজন ধরবে এবং আল্লাহ তাকে ওপরে তুলে নেবেন। তার পরে আরেকজন ধরবে, সেও তা ধরে ওপরে উঠে যাবে। এরপর আরেকজন রশিটি ধরবে এবং তা ছিঁড়ে যাবে। আবার তা জোড়া লাগবে এবং সেও তা ধরে ওপরে উঠে যাবে।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তুমি কিছু ঠিক বলেছ আর কিছু ভুল বলেছ।”

আবু বকর রা. বলেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি, আমাকে বলে দিন, আমি কোথায় ঠিক করেছি এবং কোথায় ভুল করেছি।

নবী ﷺ জবাবে বললেন, “হে আবু বকর, শপথ দিয়ে কথা বোলো না।” ৩৩

একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, সাহাবীদের স্বপ্নগুলো সেই জিনিসগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকত, যে জিনিসগুলো নিয়ে তারা জাগ্রত অবস্থায় চিন্তামগ্ন থাকতেন। আর যে জিনিসটি তাদের সবচেয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত রাখত, তা ছিল তাদের ঈমান। তাদের জীবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল তাদের ঈমান। তারা এই ঈমানের জন্যই দিনে সংগ্রাম করতেন। উপরন্তু সেই একই ফিকির তারা বিছানাতেও নিয়ে যেতেন। তাই তো তাদের স্বপ্নে সেই জিনিসগুলোই প্রতিফলিত হতো। আমরা রাসূলের সহচর সাহাবীদের কথা অবাক হয়ে চিন্তা করি, নবীজি ﷺ-এর কতই-না নিকটবর্তী ছিলেন তারা! নবীজিকে নিয়ে কতই-না চিন্তামগ্ন থাকতেন তারা! বস্তুত তারা যেমন জাগ্রত অবস্থায় নবীজির ও ঈমানের চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন, তেমনি ঘুমের সময়গুলোতেও সেই একই নিমগ্নতা তাদের গ্রাস করে নিত। ফলে তাদের স্বপ্নেও সেই একই জিনিস ফুটে উঠত।

মাঝে মাঝে নবীজি ﷺ নিজের দেখা স্বপ্নবৃত্তান্ত সাহাবীদের কাছে বর্ণনা করতেন এবং

[৩৩] মুসনাদ আহমদ: ২১১৩; আবু দাউদ: ৪৬৩২; তিরমিযী: ২২৯৩

সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যাও বলে দিতেন। সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন আমরা কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছি কি না। আমরা না-বাচক উত্তর দিলাম। তিনি বললেন, ‘গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, দুজন ব্যক্তি আমার নিকট এসে আমাকে হাতে ধরে পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যায়।’” বিশদ এ হাদীসের বাকি অংশে আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে এমন লোকদের পরকালীন অবস্থার কিছু বিবরণ এবং তাদের শাস্তির কারণ বিবৃত রয়েছে। এই হাদীসে কিয়ামত দিবসেরও কিছু বিবরণ রয়েছে।

সকালের এই সময়টাতে নবীজি ﷺ সাহাবীদের সাথে আলাপচারিতায় কাটাতেন। কখনো তিনি সাহাবীদের কথোপকথন শুনতেন আবার কখনো-বা নিজেও তাতে যোগ দিতেন। সাহাবীরা হয়তো তাদের ইসলামপূর্ব জীবনের গল্প করতেন। তাঁরা কীভাবে জাহিলিয়াতে থাকতে অজ্ঞতাবশত অমূলক কাজকর্ম করতেন, কীভাবে সেসব কাজকর্মের অসাড়া অনুভব করলেন এবং কীভাবে ইসলাম তাদের জীবনকে আলোকিত করল এসব ব্যাপার নিয়ে কথা বলতেন। মাঝে মাঝে তো তাঁরা তাদের ইসলামপূর্ব জীবনের অজ্ঞতাপূর্ণ কাজকর্মের কথা বলে নিজেরাই হাসতেন। নবীজি ﷺ-ও মাঝে মাঝে মুচকি হেসে তাদের সাথে যোগ দিতেন। নবীজির হাসি মুচকি হাসিতেই সীমাবদ্ধ থাকত। তিনি সাধারণত সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কাল মসজিদেই অতিবাহিত করতেন। এ সময়টাতে তিনি খুব অত্যুজ্জ্বল অবস্থায় থাকতেন।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় তিনি পড়তেন :

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ۝
اللَّهُمَّ اغْصِنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থ : আল্লাহর নামে (বের হচ্ছে)। আল্লাহর রাসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ, আপনি আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার দয়ার দরজাগুলো খুলে দিন। হে আল্লাহ, আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে হেফাযত করুন।’ ৩৪

এরপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মুমিনীনদের কক্ষে যেতেন। গৃহে প্রবেশ করে প্রথমেই তিনি মিসওয়াক করতেন। পরিবারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলতেন, “আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন, হে গৃহের অধিবাসীগণ?”

সকালের এই সময়টাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তাদের অভ্যর্থনা জানাতেন এবং তাদের জন্য দুআ করতেন; কিন্তু কারও সাথেই বেশিক্ষণ থাকতেন না। তিনি যদি উম্মুল মুমিনীনদের কারও কক্ষে প্রবেশ করে তাদের ইবাদাতরত অবস্থায় দেখতেন, তাহলে সেভাবেই রেখে চলে আসতেন।

বর্ণিত আছে, নবীজি ﷺ একবার জুয়ায়রিয়্যাহ রা. এর কক্ষে প্রবেশ করে তাকে ইবাদাতের স্থানে যিকিরমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন নবীজি ﷺ সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন, যাতে করে জুয়ায়রিয়্যাহ রা. স্বীয় ইবাদাত চালিয়ে যেতে পারেন।

কখনো নবীজি ﷺ-এর খেতে ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের শুধু জিজ্ঞেস করতেন, “তোমাদের কাছে কী (খাওয়ার মতো) কিছু আছে?”

যদি তাদের কাছে খাদ্য থাকত, তাহলে তারা তা নিয়ে এসে নবীজিকে ﷺ দিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ খাবারগুলো খুবই সাধারণ আর হালকা ধরনের হতো, যেমন : কিছু খেজুর, পনির অথবা হায়েস। ৩৫ কখনো কখনো এই সময় তাঁর খাদ্য হতো শুধু এক গ্লাস দুধ বা কিছু খেজুর বা মধুর মিশ্রণে বানানো আরবদের পান করা একধরনের পানীয়। ৩৬ যদি তাদের কাছে দেয়ার মতো কোনো খাবার না থাকত তখন নবীজি ﷺ বলতেন, “তাহলে আমি আজ রোজা রাখছি।”

[৩৫] হায়েস হচ্ছে খেজুর, পনির আর ঘিয়ের মিশ্রণে বানানো শুকনো খাদ্য, যা আরবরা সফরের সময় নিয়ে যেতো।

[৩৬] এক বিশেষ ধরনের পানীয় যা খেজুর, কিশমিশ আর মধু মিশিয়ে বানানো হয়। এগুলোতে পানি মিশিয়ে একদিন বা কিছু বেশি সময় রেখে দেওয়া হয়। এধরনের পানীয় জায়েয যতক্ষণ না তা ওয়াইনের মত (মদ) না হয়ে যায়।

ফের মসজিদে

উন্মুল মুমিনীনদের সবার সাথে সাক্ষাৎ শেষে নবীজি ﷺ আবার মসজিদে ফিরে আসতেন। মসজিদে প্রবেশ করে তিনি দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন। নবীজী সাধারণত ‘মুহাজিরীন স্তম্ভ’ নামক একটি স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে এই দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। এই স্তম্ভটির অবস্থান ছিল বরকতময় ‘রিয়ায়ুল জাম্মাহ’ এর মধ্যবর্তী স্থানে। নফল সালাতের জন্য নবীজি ﷺ প্রায়ই এ জায়গাটি পছন্দ করতেন।^{৩৭}

তারপর তিনি ‘রিয়ায়ুল জাম্মাহ’ নামক স্থানে বসতেন। তাঁর পিঠ থাকত আয়িশা রা. এর কক্ষের দিকে। সাহাবীগণ তখন প্রিয় নবীর চারপাশে জমায়েত হতেন। নবীজি ﷺ এই সময়টাতে সাহাবীদের নিয়ে নিয়মিত বসতেন, তা সবার জানা ছিল। তাই কারও যদি নবীজির সাথে কোনো প্রয়োজন থাকত তবে তারা এই সময়ে মসজিদে এসে প্রিয় নবীর সাথে দেখা করতেন।

সাত-সকালের এ মজলিসে সাহাবীদের সংখ্যা কখনো কম আবার কখনো বেশি হতো। যখন সংখ্যা অল্প থাকত তখন তারা গোল হয়ে নবীজিকে ঘিরে বসতেন। আর সংখ্যায় বেশি থাকলে সাহাবীগণ নবীজিকে মাঝখানে রেখে ডানে ও বামে দুই কাতার করে বসতেন। ফলস্বরূপ কেউ যদি রাসূলের কাছে কোনো প্রয়োজনে আসতে চাইত বা কারও কোনো প্রশ্ন থাকত, তাহলে সে সহজেই রাসূলের নিকটে যেতে পারত। এ রকমই ছিল আমাদের প্রিয় নবীর বরকতময় মজলিস।

এ সময়টাতে রাসূল ﷺ সাহাবীদের সাথে কথা বলতেন। লোকদের মধ্যে রাসূল ﷺ ছিলেন সবচেয়ে বেশি বাগ্মিতার অধিকারী—সুবক্তা। সবাই তাঁর কথা শুনতে ভালোবাসত।

[৩৭] মুহাজির সেন্সব সাহাবীদের বলা হয়, যারা মক্কা থেকে মদীনায হিজরত করেন। ‘মুহাজিরীন স্তম্ভ’ রিয়ায়ুল জাম্মাহ নামক স্থানে অবস্থিত। আর রিয়ায়ুল জাম্মাহ হচ্ছে নবীজির মসজিদে অবস্থিত তার গৃহ ও খুতবা দেয়ার স্থানের মাঝের জায়গাটুকু। রিয়ায়ুল জাম্মাহকে নবীজি বেহেশতের বাগানের অংশ বলে অভিহিত করেছেন। এটি আর-রাওদাহ নামেও পরিচিত।

নবীজির কথা বলার ধরন ছিল অত্যন্ত সুন্দর; না তিনি অতি দ্রুত কথা বলতেন, আর না তিনি অতি ধীরে কথা বলতেন—বরং তিনি প্রত্যেকটি শব্দ পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতেন। তাই কেউ যদি গুনতে চাইত যে কোন কথা রাসূল ﷺ কয়বার বললেন, সে তা অনায়াসেই গুনতে পারত। আয়িশা রা. বলেন, “তোমরা যেভাবে কথা বলো, আল্লাহর রাসূল সেভাবে কথা বলতেন না। তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। যাতে করে তাঁর কাছে বসে কথা শুনছেন এমন প্রত্যেকেই কথাগুলো মুখস্থ করে নিতে পারে।”

রাসূল ﷺ শুধু নিজেই কথা বলতেন না, প্রায়ই সাহাবীদের সাথে কথোপকথন করতেন। কখনো তিনি সাহাবীদের প্রশ্ন করতেন যাতে সাহাবীগণ উত্তর জানার ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করেন।

একবার তিনি বললেন, “আমি কি তোমাদের বলব সবচেয়ে বড় গুনাহ কী?”

সাহাবীগণ বললেন, “দয়া করে আমাদের বলে দিন, হে আল্লাহর রাসূল!”

তখন রাসূল জবাব দিলেন, “আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।” ৩৮

আবার কখনো-বা রাসূল ﷺ সাহাবীদের কাছে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতেন যাতে আরও গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপারে সাহাবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, “তোমরা কী জানো, কে দেউলিয়া?”

সাহাবীগণ বললেন, “দেউলিয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার কোনো অর্থ বা সম্পত্তি নেই।”

তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, “আমার উম্মতের মধ্যে সে ব্যক্তি প্রকৃত দেউলিয়া, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাতের সওয়াব নিয়ে আসবে; অথচ (সে দুনিয়াতে) কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ ভোগ করেছে, অমুককে হত্যা করেছে ও আরেকজনকে প্রহার করেছে। এরপর তার নেক আমলগুলো বদলা হিসেবে ওই লোকদের দিয়ে দেওয়া হবে। পাওনাদারদের হক পরিশোধের আগেই তার নেক আমল নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের পাপের একাংশ তাদের কাছ থেকে নিয়ে ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। পরিশেষে তাকে জাহান্নামে

নিষ্ক্ষেপ করা হবে।” ৩৯

মাঝে মাঝে রাসূল ﷺ সাহাবীদের প্রশ্ন করতেন, যাতে করে সাহাবীগণ উত্তরের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করেন। একবার রাসূল সাহাবীদের প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা বলো তো কোন সে গাছ, যার প্রকৃতি মুসলিমদের মতো। সে তার পাতা কখনো বিসর্জন দেয় না আর সারাবছরই ফল প্রদান করে।”

সাহাবীগণ বিভিন্ন স্থানে জন্মানো নানা প্রজাতির গাছের নাম বললেন। কিন্তু প্রত্যেকবার রাসূল ﷺ তাদের উত্তরকে নাকচ করে দিলেন। সেখানে যে দশ জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে সবার ছোট ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা। তিনি ভাবলেন এর উত্তর হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আশেপাশে তাকিয়ে তিনি আবু বকর আর নিজ পিতা উমরের মতো সাহাবীদের দেখে উত্তর দেয়ার সাহস পেলেন না। পরে রাসূলই বলে দিলেন, এটি হচ্ছে খেজুর গাছ। ৪০

রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে নিজের বক্তব্যের কিছু অংশ তিনবার বলতেন। তিনি এটি করতেন কোনো কথার গুরুত্ব বোঝাতে অথবা নিশ্চিত হতে যে, সবাই কথাটি বুঝতে পেরেছে। তিনি গুরুত্ব বোঝাতে তিনবারের বেশি একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন এমন নজিরও আছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি একবার কবির গুনাহ সম্পর্কে বলছিলেন। তখন বললেন, “আর ইচ্ছা করে মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য করাও (কবির গুনাহ)।” তিনি এ কথাটি এত বেশিবার পুনরাবৃত্তি করছিলেন যে উপস্থিত সবাই কামনা করছিল তিনি যাতে থামেন। সবাই বুঝতে পারছিল যে রাসূল অত্যন্ত কঠোরভাবে এ কাজগুলো করতে নিষেধ করছেন।

রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে সাহাবীদের হঠাৎ করে প্রশ্ন করতেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর থেকে এমন সিদ্ধান্তের দিকে ধাবিত হতেন, যা সাহাবীদের কল্পনাতেই থাকত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাসূল একবার সাহাবীদের প্রশ্ন করলেন, “আজ কে কে সিয়াম (রোযা) পালন করছে?” সাহাবীগণ তো এমন প্রশ্নের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। যদি তারা জানতেন আজই রাসূল এ প্রশ্ন করবেন, তবে হয়তো তাদের প্রত্যেকেই সেদিন রোযা রাখতেন। তাই তারা সবাই চুপ থাকলেন। আবু বকর রা. শুধু জবাব দিলেন যে, তিনি রোযা আছেন।

[৩৯] মুসনাদ আহমদ: ৮০২৯; তিরমিযী: ২৪১৮

[৪০] মুসনাদ আহমদ: ৪৫৯৯; তিরমিযী: ২৮৬৭

রাসূল ﷺ আবার প্রশ্ন করলেন, “তোমাদের মধ্যে কে কে আজ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়েছে?”

এবারও শুধু আবু বকর রা.-ই ইতিবাচক জবাব দিলেন। রাসূল এবার আরেকটি প্রশ্ন করলেন, “তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযায় অংশগ্রহণ করেছে?”

আবু বকর ছাড়া এবারও সবাই চুপ থাকল। রাসূল পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, “আজ কারা একজন দরিদ্র লোককে আহর করিয়েছে?”

উপস্থিত সবাই নীরব থাকলেন, কিন্তু আবু বকর জবাব দিলেন যে, তিনি আহর করিয়েছেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, “যদি একজন ব্যক্তি এ চারটি কাজ একই দিনে করে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে জান্নাতী।” ^{৪১}

নবীজি ﷺ মাঝে মাঝে প্রতীকীভাবে কথা বলে কোনো বিষয়কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতেন। একবার নবীজি মানুষের অন্তর থেকে ঈমান ও আমানতদারী উঠে যাবার ব্যাপারে কথা বলছিলেন। তিনি ﷺ বলেন, “একজন মানুষ হয়তো ঘুমোবে আর তখন তার অন্তর হতে আমানত ^{৪২} তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে একটি বিন্দুর মতো। এরপর আবার যখন সে ঘুমোবে তখন তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন ফোসকার মতো থেকে যাবে। যেমন একটি জ্বলন্ত অঙ্গুরিকে যদি তুমি তোমার পায়ে ওপরে রেখে দাও এতে পায়ে ফোসকা পড়ে যাবে এবং তুমি তা ফোলা দেখতে পাবে। অথচ তাতে (পুঁজ-পানি ব্যতীত) কিছু নেই। এ সময় মানুষ বেচাকেনা করবে ঠিকই, কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। (আমানতদার ব্যক্তি এত কমে যাবে যে,) বলা হবে, অমুক বংশে একজন আমানতদার আছেন। কাউকে বলা হবে সে কতই-না বাহাদুর, কতই-না হুঁশিয়ার আর বুদ্ধিমান; অথচ তার অন্তরে দানা-পরিমাণ ঈমানও নেই।” ^{৪৩}

মাঝে মাঝে নবীজি ﷺ কোনো চিহ্ন এঁকে সাহাবীদের তা দেখিয়ে কোনো বিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতেন। একদিন নবীজি একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন, যেটি চতুর্ভুজের বাইরে চলে গেল। তারপর দু-পাশ দিয়ে মাঝের রেখার

[৪১] ফাযাইলুস সাহাবাহ, আহমদ: ৬৬০০; আল-আদাবুল মুফরাদ: ৫১৫

[৪২] হাদীসে আমানত বলতে ঈমানকে বুঝানো হয়েছে। সূরা আহযাবের ৭২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ঈমানকে আমানত বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীসে মানুষের অন্তরে ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

[৪৩] সহীহ বুখারী: ৭০৮৬

সাথে ভেতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মেলালেন এবং সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কী জানো, এটা কী?”

সাহাবীগণ জবাব দিলেন, “আল্লাহ আর তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।”

তখন নবীজি বললেন, “এ মাঝামাঝি রেখাটা হলো মানুষ। আর ছোট ছোট রেখাগুলো নানারকম বিপদাপদ। এসব বিপদাপদ প্রত্যেক দিক থেকে তার নিকটে আসে। যদি সে এর একটাকে এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে আক্রমণ করে। আর অন্যটাকেও যদি এড়িয়ে যায়, তবে পরবর্তী অন্য একটি তাকে আক্রমণ করে। আর চতুর্ভুজটি হলো তার মৃত্যু; যা তাকে ঘিরে রেখেছে এবং একসময় তাকে ধরে ফেলবে। আর বাইরের দিকে বর্ধিত রেখাটি হলো তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। সে এমন-সব জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করে, যা তার জীবনের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়; অথচ এর আগেই মৃত্যু এসে তাকে ধরে ফেলে।”

তারবিয়াত আর তাসাওউফের এ মজলিসগুলো ছিল সাহাবীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সময়। নবীজি ﷺ শুধু নিজে বক্তৃতা দিয়ে একপেশেভাবে শিক্ষা দিতেন না; বরং তিনি দ্বিপাক্ষিক কথোপকথনে বেশি আগ্রহী ছিলেন। এতে শিক্ষার্থী সাহাবীগণও অংশ নিতে পারতেন। এই সময়টা ছিল প্রাণবন্ত এক অধিবেশন। আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাহাবীগণ তারবিয়াত লাভ করতেন ও নিজেদের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধন করতে পারতেন।

এই অধিবেশনের আরেকটি উদ্দীপক বিষয় ছিল ঘন ঘন ইস্তেগফার পাঠ। সাহাবীগণ লক্ষ করতেন যে, তাদের প্রিয় রাসূল ﷺ ক্রমাগত ইস্তেগফার পাঠের মাধ্যমে মহান রবের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। তারা কখনো কখনো গুনেও রাখতেন যে, একই অধিবেশনে রাসূল এক শ বার ইস্তেগফার পাঠ করেছেন। একবার তিনি এই দু'আটি এক শ বার পাঠ করেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবাহ কবুল করুন। আপনিই একমাত্র সত্তা, যিনি তাওবা কবুলকারী ও দয়াময়।” ৪৪

সকালে নবীজি ﷺ যখন মসজিদে অবস্থান করতেন, তখন ছোট শিশুদের তাঁর কাছে নিয়ে আসা হতো। তিনি তাদের জন্য দু'আ করতেন। মাঝে মাঝে তিনি একটি খেজুর

মুখে নিয়ে নরম করে তারপর শিশুদের মুখে দিতেন। এতে করে শিশুরাও খেজুরের সাথে লেগে থাকা নবীজি-এর বরকতময় থুতু মোবারকের সামান্য অংশ লাভ করত। তিনি মাঝে মাঝে শিশুদের নাম রেখে দিতেন এবং তাদের দুয়া করতেন।

একবার আবু উসাইদ মালিক ইবনু রাবিয়াহ আল সাঈদী রা. নিজের নবজাতক শিশুকে এনে নবীজি-এর কোলে দিলেন। শিশুটি নবীজির কোলে ছিল আর আবু উসাইদ রা. নবীজির পাশে বসে ছিলেন। তারপর নবীজি অন্য কাজে মনোযোগী হয়ে পড়লেন। আবু উসাইদ ইশারা দিয়ে নিজের পরিবারের কাউকে দিয়ে বাচ্চাটিকে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন। নবীজির হঠাৎ খেয়াল হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, শিশুটি কোথায়?

আবু উসাইদ তখন বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি।”

নবীজি শিশুটির নাম জিজ্ঞেস করলেন। আবু উসাইদ নাম জানালে নবীজি বললেন, “না, তাকে এই নামে ডাকবে না। তাকে আল-মুনযির নামে ডাকবে।” আবু উসাইদ তারপর থেকে সেই সন্তানকে আল মুনযির নামেই ডাকতেন।^{৪৫}

খেজুর ছিল মদীনার প্রধান ফল। মদীনাবাসীর প্রধান খাদ্যও ছিল খেজুর। তাই বছরে প্রথম যখন খেজুর পাকতে শুরু করত তা দেখে মদীনাবাসী খুবই প্রীত হতো। তারা সেই পাকা খেজুর নবীজি-এর জন্যই প্রথমে নিয়ে আসত। নবীজি তা নেওয়ার পর এই বলে দুআ করতেন :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا،
وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدَّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيِّكَ، وَإِنِّي
عَبْدُكَ وَنَبِيِّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ
لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ مَعَهُ

অর্থ : “হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ফল-ফলাদিতে বরকত দিন, আমাদের শহরে বরকত দিন, আমাদের সা তথা বড় পরিমাপক পাত্রে বরকত দিন, আমাদের মুদ তথা ছোট পরিমাপক পাত্রে বরকত দিন। হে আমার রব, ইবরাহীম (আ.) ছিলেন আপনার বান্দা, বন্ধু ও নবী। আর আমিও আপনার বান্দা ও নবী। ইবরাহীম (আ.) আপনার কাছে

মক্কা নগরীর জন্যে (সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার) দুআ করেছিলেন। আর আমি আপনার নিকট এই মদীনা নগরীর জন্যে দুআ করছি। সেই দুআই যা, ইবরাহীম (আ.) মক্কা নগরীর ব্যাপারে করেছিলেন এবং তার দ্বিগুণ।”^{৪৬}

তারপর নবীজি ﷺ সেখানে উপস্থিত হয়ে সবচেয়ে ছোট বাচ্চাকে ডাকতেন আর তার হাতে ফলটি দিতেন।

নবীজি ﷺ-এর মাহফিলে মাঝে মাঝে হাস্যরসিকতাও হতো। নবীজি রাশভারী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং সাহাবীগণ নবীজিকে অত্যন্ত সম্মান করতেন, আদব বজায় রাখতেন। কিন্তু তা সাহাবীদেরকে তাদের প্রিয় নবীজির সাথে স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক ব্যবহার ও কথাবার্তা বলায় বাধা দিত না।

একদিন নবীজি সাহাবীদের সাথে কথা বলছিলেন এবং একজন বেদুইনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নবীজি ﷺ বলছিলেন, “জান্নাতবাসীদের কোনো একজন তার রবের কাছে চাষাবাদের অনুমতি চাইবে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি কি যা চাও, তা পাচ্ছ না?”

সে বলবে, “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার চাষ করার খুবই আগ্রহ।”

তারপর সে বীজ বুনেবে এবং তার চারা জন্ম নেওয়া, গাছ বড় হওয়া ও ফসল কাটা সবকিছু পলকের মধ্যে হয়ে যাবে। আর তা (ফসল) হবে পাহাড়-সমান। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, “হে আদমসন্তান, এগুলো নিয়ে নাও। কোনো কিছুই তোমাকে তৃপ্তি দেয় না।”

নবীজির কথা শেষ হলে বেদুইন লোকটি বলে উঠল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর কসম, এই ধরনের লোক আপনি কুরায়শী বা আনসারদের মধ্যেই পাবেন। কেননা, তারা চাষাবাদ পছন্দ করে। আর আমরা বেদুইনদের চাষাবাদের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই।”

এ কথা শুনে উপস্থিত সকল সাহাবীগণ এমনকি নবীজিও হেসে ফেললেন।^{৪৭}

বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রতিনিধিদলও সকালের এই সময়ে রাসূল ﷺ-এর সাথে দেখা করতে আসত। সফরকারী প্রতিনিধিদল সাধারণত রাতে মদীনার বাইরে অবস্থান করে সকালে শহরে প্রবেশ করে রাসূলের সাথে দেখা করতে মসজিদে আগমন করত।

[৪৬] সহীহ মুসলিম: ১৩৭৩

[৪৭] মুসনাদ আহমদ: ১০৬৪২

রাসূল ﷺ তখন মসজিদেই সাহাবীদের সাথে অবস্থান করতেন। একবার মুদার গোত্র থেকে আগত একদল প্রতিনিধি নবীজি ﷺ-এর সাথে দেখা করতে আসল। তখন দুপুর হয়ে গেছে। রাসূল ﷺ তাদের দেখেই বুঝতে পারলেন যে, তারা দুর্বিষহ দারিদ্র্যের মাঝে দিনাতিপাত করছে। রাসূল ﷺ-এর চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল। যোহরের সালাত পড়ানোর পর তিনি সাহাবীদের সাদাকা প্রদানের জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন। ফলে মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর সামনে দুই স্তূপ কাপড় ও খাবার জমা হলো। পরে তিনি সেগুলো তাদের দিয়ে দিলেন।

আরেকবার আরবের পূর্বাঞ্চল থেকে আলহাসা নামক স্থানের আব্দুল কায়সের গোত্র থেকে একদল প্রতিনিধি আসল। রাসূল ﷺ তাদের স্বাগত জানিয়ে বললেন, “এই প্রতিনিধিদলকে অভিবাদন! না তোমরা কখনো অপমানিত হবে, আর না কখনো অনুশোচনা বোধ করবে।”

সম্ভবত সকালের এই বরকতময় সময়েই ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) মানুষের বেশে রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতে এসেছিলেন। সবাই তখন খুব অবাক হচ্ছিলেন। কারণ, উপস্থিত কেউ সেই মানুষটিকে চিনত না। উপরন্তু, তাঁর কাপড় ছিল অতিরিক্ত সাদা ও চুল ছিল অতিরিক্ত কালো। ভ্রমণের কোনো ক্লান্তি তাকে স্পর্শ করেনি। তিনি নবীজি ﷺ-কে ইসলাম, ঈমান, ইহসান ও কেয়ামতের লক্ষণের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন।

সম্ভবত এমন কোনো এক সকালেই দ্বিমাম ইবনু সালাবাহ রা. এসেছিলেন নবীজি ﷺ-এর সাথে দেখা করতে। তিনি মসজিদের সামনে তার উটকে বসালেন আর উপস্থিত সবাইকে প্রশ্ন করলেন, “তোমাদের মধ্যে ইবনু আব্দুল মুত্তালিব কে?”

নবীজি জবাব দিলেন, “এই যে আমি।”

দ্বিমাম রা. বললেন, “আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই আর আমি শক্ত প্রকৃতির হব। তাই আমার কথাকে রুঢ়ভাবে নেবেন না।”

নবীজি বললেন, “তোমার যা-ই প্রশ্ন আছে, তা তুমি করতে পার।”

দ্বিমাম রা. বললেন, “আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি সেই প্রভুর নামে, যিনি আপনার রব এবং আপনার পূর্বে যারা এসেছিলেন তাদের সবারও রব, আপনাকে কি আল্লাহ সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?”

নবীজি ﷺ জবাব দিলেন, “আল্লাহর কসম! তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।”

তারপর তিনি নবীজিকে ইসলামের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন আর নবীজিও জবাব দিলেন। তারপর তিনি বললেন, “সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্যের বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি এগুলোর সাথে না নতুন কিছু অতিরিক্ত যোগ করব, না এগুলোর কিছু ছেড়ে দেব।”

দ্বিমাম ইবনু সালাবাহ রা. চলে গেলে নবীজি বললেন, “লোকটি উপকারী জ্ঞান শিক্ষালাভ করেছে। সে যদি তার কথার ব্যাপারে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে জান্নাতী হবে।”

বিশেষ সময়ে বা জরুরি মুহূর্তে সকালের এই বরকতময় সময়টা মুসলিম উম্মাহর জন্য পরামর্শসভায় রূপ নিত। তখন সবাই ঘটমান বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতেন। উহুদ যুদ্ধের পূর্বে আক্রমণকারী কাফির বাহিনীকে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে সে ব্যাপারে পরামর্শসভা এমন সময়েই হয়েছিল। কাফির ও ইহুদীদের সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ থেকে মদীনা শহরকে প্রতিরক্ষা করার জন্য খন্দক খননের পরিকল্পনা এই সময়টাতেই নেয়া হয়েছিল। এ ছাড়া নানা সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে নবীজি ﷺ এ সময়টাতেই সাহাবীদের সাথে মাশোয়ারা (পরামর্শ) করতেন।

আর কোনো নেতারই এত বেশি মাশোয়ারা করার নজির নেই, যতটুকু মাশোয়ারা উম্মাহর বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে নবীজি ﷺ সাহাবীদের সাথে করতেন। তিনি আল্লাহর আদেশ মেনেই এই মাশোয়ারা করতেন। আল্লাহ বলেন :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“... এবং কাজকর্মের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর যখন তুমি সংকল্প করে নেবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভরসাকারীদের পছন্দ করেন।” ৪৮

সাহাবীদের অনেকে পালাক্রমে এই অধিবেশনে নবীজি ﷺ-এর সাথে অংশ নিতেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, “আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন, যিনি মদীনার উঁচু এলাকায় বাস করতেন। আমরা পালাবদল করে করে নবীজির হালাকায় (আলোচনা সভা) অংশ নিতাম। একদিন তিনি যেতেন আর আরেকদিন আমি যেতাম। যেদিন আমি যেতাম সেদিন যা ঘটেছে তার সব আমি (ফিরে এসে) তার কাছে বর্ণনা

করতাম এবং কুরআনের কোনো অংশ নাযিল হলে তাও বলতাম। যেদিন তিনি যেতেন, (ফিরে এসে) তিনিও একইভাবে (আমার কাছে বর্ণনা) করতেন।”

নবীজি ﷺ এসব হালাকাতে সাহাবীদের সাথে এমনভাবে বসতেন যেন তিনিও তাদেরই একজন। নবীজিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার কোনো উপায় ছিল না। যখন কোনো অপরিচিত আগন্তুক আসত, সে চিনতে পারত না নবীজি আসলে কোনজন। হয়তো সে প্রশ্নও করত, “তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে?”। সাহাবীরা নবীজির উজ্জ্বল চেহারার বর্ণনা দিয়েই তাকে পরিচয় করিয়ে দিতেন। তারা বলতেন, “আমাদের মাঝে বসে থাকা উজ্জ্বল চেহারাশিষ্ট ব্যক্তিটিই হলেন মুহাম্মাদ ﷺ।”

এসব বিষয় লক্ষ করে শেষতক সাহাবীরা নবী ﷺ-কে পরামর্শ দিলেন যে, তারা নবীজির জন্য কাদামাটি দিয়ে একটি নিচু আসন বানিয়ে দিতে চান, যাতে করে অপরিচিত কেউ আসলে সহজেই নবীজিকে চিনতে পারেন। নবীজি এতে সম্মতি দিলেন। এই ঘটনাটি অবশ্য নবীজির বরকতময় জীবনের শেষদিকের ঘটনা, হিজরী নবম সালের দিকে। সে বছর দলে দলে প্রতিনিধি মদীনায়ে আসছিল বলে ওই বছরকে ‘প্রতিনিধিদলের বছর’ বলা হয়।

নিজের মুচকি হাসি আর মনোযোগ নবীজি ﷺ যেন সকল সাহাবীদের মাঝে ভাগ করে দিতেন। যখন তারা নববী মজলিস থেকে ফিরে আসতেন, প্রত্যেক সাহাবীই মনে করতেন, তিনিই বুঝি নবীজির সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী।

মাঝে মাঝে নবীজি ﷺ যখন সাহাবীদের সাথে উপবিষ্ট থাকতেন, তখন কেউ এসে নবীজিকে খাবার হাদিয়া দিত। তিনি সাহাবীদের সাথে তা ভাগ করে খেতেন। সামুরাহ ইবনু জুন্দুব রা. থেকে বর্ণিত, “আমরা একবার নবীজির সাথে ছিলাম। তখন নবীজির জন্য এক ট্রেতে করে কিছু ছারিদ^{৪৯} নিয়ে আসা হলো। নবীজি ﷺ তা খেলেন। লোকেরাও সেখান থেকে তা খেল। দুপুর হওয়া পর্যন্ত একদলের পরে আরেক দল এসে তা খেতেই থাকল।”

বর্ণনাকারীকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, “পাত্রতে যে খাবার ছিল, তা শেষ হয়ে গেলে কি কেউ আবার তা পূর্ণ করে দিচ্ছিল?”

তিনি জবাব দিলেন, “দুনিয়া থেকে তো কেউ দিচ্ছিল না। যদি কেউ পূর্ণ করে দিতে

[৪৯] ছারিদ হচ্ছে আরবদের প্রধান খাদ্য, যা তারা রান্না করত। এটির প্রধান উপকরণ ছিল রুটি আর মাংস।

থাকেন, তবে তা আকাশ থেকেই হচ্ছিল।”

একবার নবীজি ﷺ-কে একটি ভেড়া হাদিয়া দেয়া হলো। মদীনায় তখন খুব অভাব অনটন চলছিল। তিনি তাঁর পরিবারকে বললেন, “এই ভেড়াটি (রান্না করে) প্রস্তুত করো। এই রুটিগুলো নাও। ছোট ছোট টুকরো করো এবং এগুলো হতে হারিদ প্রস্তুত করো।” নবীজির একটি বিশাল ট্রে ছিল যার নাম ছিল আলঘাররা। এটি বহন করতে ছয় জন মানুষ লাগত। সকালে যখন নবীজি ﷺ এবং সাহাবীগণ সালাতুদ-দ্বোহা এর নফল সালাত আদায় করছিলেন, তখন ট্রেতে খাদ্য প্রস্তুত করে নবীজির সামনে নিয়ে আসা হলো। সবাই নবীজির আশেপাশে জড়ো হয়ে গেল। অনেক বেশি লোকসমাগম হওয়ায় নবীজি ﷺ হাঁটু গেড়ে বসলেন। এক বেদুইন বলে বসল, “এটা কী ধরনের বসা!”

নবীজি ﷺ বললেন, “আল্লাহ তাআলা আমাকে নিজের অতিথিপরায়ণ দাস হিসেবে বানিয়েছেন। তিনি আমাকে একগুঁয়ে ও স্বৈরাচারী বানাননি। এক প্রান্ত থেকে খাওয়া শুরু করো আর মাঝের অংশ রেখে দাও, এতে বরকত হবে।”

তারপর নবীজি আরও বললেন, “এখান থেকে নাও আর খাও। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ, পারস্য আর বাইজান্টাইন এলাকা তোমাদের হাতে বিজিত হবে। তোমরা খাদ্যে এমন প্রাচুর্য লাভ করবে যে, মানুষ খাদ্য গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যাবে।”

অবস্থা, পরিবেশ আর পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সকালের এই অধিবেশনটি কখনো দীর্ঘ আবার কখনো সংক্ষিপ্ত হতো। সকালের শেষদিকে নবীজি ﷺ উঠে পড়তেন। বৈঠক শেষ হয়ে গেলে তিনি এই দুআটি করতেন,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ
إِلَيْكَ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার প্রশংসা সহকারে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি সাক্ষ্য দিই যে, আপনি ছাড়া হক কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকট তওবা করি।”

একবার কেউ জিজ্ঞেস করল, “আপনাকে তো আগে কখনো এ কথাগুলো বলতে

শুনলাম না।”

নবীজি ﷺ জবাবে বললেন, “এই কথাগুলো মজলিসে কোনো ভুল হয়ে গেলে তার কাফফারা নিশ্চিত করে।”

আয়িশা রা. একবার নবীজিকে প্রশ্ন করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি লক্ষ্য করেছি, আপনি বৈঠক অথবা তিলাওয়াত কিংবা সালাত শেষে এই দুআটি পাঠ করেন। কেন?”

নবীজি ﷺ জবাবে বললেন, “যে ব্যক্তি ভালো কথা বলল, তার উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে এই কথাগুলো কেয়ামত পর্যন্ত সিলমোহর হয়ে রইবে। আর যে কোনো মন্দ কথা বলল, এই দুআ তার মন্দ কথাগুলো মুছে ফেলবে।”

খুব অল্প সময়ই এমন হয়েছে যে নবীজি ﷺ সাহাবীদের বৈঠক শেষে উঠছেন আর নিম্নোক্ত দুআটি করেননি :

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوُو بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا ، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনাকে ভয় করার সক্ষমতা আমাকে দান করুন, যা আপনার অবাধ্য হওয়া থেকে আমাকে আটকে রাখবে। আপনার বাধ্যগত হওয়ার সক্ষমতা দান করুন, যা আমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। আপনার বিশ্বাস থেকে আমাকে এ পরিমাণ অংশ দান করুন, যা আমার দুনিয়াবি বিপদাপদকে সহজ করে দেবে। আমার চোখ, আমার কান, আমার দৈহিক শক্তি ততদিন পর্যন্ত কর্মক্ষম রাখুন; যতদিন আমাকে জীবিত রাখবেন। পরেও এগুলোর উপকারিতা আমার জন্য অবশিষ্ট রাখুন। যারা আমার ওপর জুলুম করে আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। আমার শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে বিজয় দান করুন। আমার দীন পালনকে আমার জন্য বিপৎসংকুল করবেন না। দুনিয়াকে আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য এবং আমার জ্ঞানের শেষ বানাবেন না। আর আমাদের

ওপর কোনো নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে ক্ষমতাবান বানাবেন না।”

তারপর সাহাবীগণ চলে যেতেন। কেউ জীবিকা নির্বাহের কাজে বেরিয়ে পড়তেন আর কেউ-বা ক্বায়লুলার জন্য বাসায় রওনা দিতেন। নবীজি ﷺ হয়তো তখন ক্বায়লুলার জন্য বাসায় যেতেন, নতুবা মদীনার রাস্তায় হাঁটতে বের হতেন। আবার কখনো কারও দাওয়াত রক্ষার্থে চলে যেতেন। কখনো-বা রোগী দেখতে বা অন্য কাজে রওনা হতেন।

[৫১] তিরমিযী: ৩৫০২

[৫২] দুপুরে সামান্য সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়াকে ক্বায়লুলা বলে। হযরত ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সা. এরশাদ করেছেন, দিনের রোজা রাখতে রাতে সেহরি খাও এবং রাতের ইবাদতে মনোযোগী হতে দিনের বেলা কায়লুলা করো। (ইবনু মাজাহ: ১৬৯৩)

মর্দীনার পথে

নবীজি ﷺ যখন হাঁটতেন তখন তাঁর হাঁটার মাঝে শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠত। আজকালকার জনপ্রতিনিধিদের মতো মেকিহ বা হামবড়া ভাব এতে ছিল না। হাঁটার সময় তিনি এমনভাবে পা তুলতেন যে দেখে মনে হতো তিনি বুঝি মাটি থেকে কোনো জিনিস টেনে তুলছেন। যখন তিনি সামনে অগ্রসর হতেন তখন মনে হতো বুঝি তিনি কোনো ঢালু জায়গা বেয়ে নামছেন। তাঁকে দেখলেই মানুষ বুঝতে পারত তিনি কোনো দুর্বল বা অলস লোক নন। যখন তিনি কোনো দিকে ফিরতেন সমগ্র শরীরকে সেদিকে ফেরাতেন। সাহাবীগণ কখনো নবীজির সামনে আবার কখনো-বা তাঁর পাশাপাশি হাঁটতেন। কিন্তু, কখনো নবীজির পেছনে হাঁটতেন না। এমন দুজন ব্যক্তির দেখা পাওয়া যাবে না, যারা নবীজির পেছনে দাঁড়াতে পেরেছে।

এটি ছিল প্রিয়নবীর বিনয়ের চিহ্ন। অন্য নেতাদের মতো তিনি কখনো তাঁর সাথীদের আগে আগে হাঁটতেন না। তিনি তো এটা মানতেই পারতেন না যে, তাঁর সাহাবীগণ তাঁকে পেছন থেকে নতজানু হয়ে অনুসরণ করবেন। তিনি সাধারণভাবে সাহাবাগণের সাথে, তাদেরই একজন হয়ে চলাফেরা করতেন।

হাঁটার সময় তিনি হয়তো একটি লাঠি বা খেজুর গাছের শাখা ব্যবহার করতেন। তিনি কখনো ছোট লাঠি বা অর্ধ-বৃত্তাকার মাথাবিশিষ্ট লাঠি ব্যবহার করতেন। এটি আরবদের রীতি ছিল। তৎকালীন আরব সমাজে এ ধরনের লাঠির বেশ প্রয়োজন পড়ত।

চলার পথে কোনো দাস-দাসীর সাথেও যদি প্রিয়নবী ﷺ-এর দেখা হয়ে যেত আর সে কোনও সাহায্যের আবেদন জানাত, তাহলে নবীজি তার প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। কোনো গোলামের হাত ধরে তার প্রয়োজন পূরণ করতে প্রিয়নবী ﷺ কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

কারও সাথে মোলাকাত হলেই তিনি মুচকি হাসি উপহার দিতেন। জারির বিন আব্দুল্লাহ

রা. বলেন, “আল্লাহর রাসূলের সাথে যতবারই আমার দেখা হয়েছে, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসেছেন।”

তাঁর হাসি ছিল উজ্জ্বল, স্বাগতপূর্ণ। কেউ নবীজির সাথে সাক্ষাতের সময় ভাবত খাস করে শুধু তার দিকে তাকিয়েই বুঝি নবীজি ﷺ এভাবে হাসছেন। জারির রা. তো ভেবেছিলেন যে, নবীজি ﷺ এ রকম বিশেষ হাসি কেবল তাকেই উপহার দেন। তিনি প্রফুল্লচিত্তে তা হাদীসেও উল্লেখ করে গেছেন। বস্তুত, নবীজি ﷺ সবার দিকে তাকিয়েই এভাবে মুচকি হাসতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আল-হারিছ ইবনু জায রা. বলেন, “আমি এমন কাউকে দেখিনি, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অধিক মুচকি হাসতেন।”

পথ চলতে ছোট ছেলেদের সাথে দেখা হয়ে গেলে তিনি তাদের সালাম জানাতেন, স্বীয় হাত দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল মুছে দিতেন। জাবির ইবনু সামুরাহ রা. হতে বর্ণিত, “নবীজি একদিন বের হলেন। আমিও সাথে ছিলাম। কতিপয় কিশোরের সাথে মোলাকাত হলো। তিনি প্রত্যেকের গাল মুছে দিলেন। এমনকি নবীজি ﷺ আমারও গাল মুছে দিলেন। আমি খেয়াল করলাম তাঁর হাত শীতল এবং সুগন্ধিযুক্ত। মনে হচ্ছিল যেন আতরের বুড়ি^{৫৩} থেকে তিনি মাত্র তাঁর হাত বের করে এনেছেন। আমার যে-গাল নবীজি মুছে দিয়েছিলেন তা আমার অন্য গাল থেকে ভালো ছিল।”

নবীজি ﷺ অনেক সময় আনসারদের এলাকায় তাদের দেখতে চলে যেতেন। আনসারদের ছেলেরা তখন হয়তো তাঁর কাছাকাছি চলে আসত, সাথে সাথে হাঁটত। তিনি তাদের সালাম জানাতেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তাদের জন্য দুআ করতেন।

একদিন তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের এলাকা দিয়ে হাঁটছিলেন। আনসারদের দাসীরা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসল। তারা তখন তাম্বুরা বাজিয়ে গান গাচ্ছিল :

আমরা আন-নাজ্জারের দাসী

মুহাম্মাদ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী

নবীজি ﷺ তাদের বলেন, “আল্লাহ জানেন যে, আমার হৃদয় তোমাদের ভালোবাসে। হে আমার রব, তুমি তাদের সবাইকে বরকত প্রদান করো।”

একদিন তিনি মসজিদে গিয়ে একদল মহিলাকে সেখানে বসে থাকতে দেখলেন। তখন

[৫৩] সে আমলে আতর ব্যবসায়ীরা এক বিশেষ ধরনের বুড়িতে তাদের আতর রাখতো। এখানে এধরনের বুড়ির কথা বলা হচ্ছে।

হাতের ইশারায় প্রিয় নবী ﷺ তাদের সালাম জানালেন।^{৫৪}

সাহাবাদের সাথে দেখা হলে আল্লাহর রাসূল ﷺ আগে সালাম দিতেন। তাদের সাথে মুসাফাহা^{৫৫} করতেন ও তাদের জন্য দুআ করতেন। মুসাফাহার সময় তিনি নিজ থেকে হাত সরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য ব্যক্তি হাত না সরাতেন। যখন কারও সাথে নবীজির দেখা ও কথা হতো, তিনি তার থেকে নিজের মুখ ফেরাতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিত।

কেউ যদি আল্লাহর রাসূলের সাথে কথা বলার জন্য তাকে থামাতে চাইত, তিনি থামতেন। কোনো দাসী বা মুক্ত মহিলা থামার জন্য আবেদন জানালেও তিনি তাদের সাথে কথা বলার জন্য থামতেন। আদি বিন হাতেম রা. নবীজির সাথে তার প্রথম সাক্ষাতের কাহিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেন : “আমি নবীজির সাথে হাঁটছিলাম। একজন মহিলা, যার সাথে একটি ছোট বাচ্চাও ছিল, সে হঠাৎ নবীজিকে ডেকে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের আপনার সাথে কিছু কথা বলার প্রয়োজন ছিল।’

তারা একান্তে নবীজির সাথে কথা বলল। নবীজি ﷺ তাদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারা দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলছিল, যতক্ষণ না আমি গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ালাম। আমি ভাবলাম, ‘এটি নিশ্চিত যে, তিনি আমার ধর্মের কিংবা নুমান ইবনু মুনযিরের ধর্মের কোনো অনুসারী নন। তিনি যদি কোনো রাজা হতেন তাহলে এত দীর্ঘ সময় কোনো ছেলে বা মহিলা তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারত না। আমি অনুভব করলাম আমার অন্তর নবীজির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছে।’”

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাঁটার ধরন খুবই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, এতে কোনো মেকি গান্ধীর্ষপনা বা আড়ম্বরতা ছিল না। একদিনের ঘটনা। তিনি এক যুবককে জবাইকৃত ভেড়ার চামড়া ছাড়াতে দেখলেন। কিন্তু, যুবকটি তার কাজ সঠিকভাবে করতে পারছিল না। নবীজি ﷺ তার কাছে গিয়ে বললেন, “পাশে সরে দাঁড়াও, যাতে আমি তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি কীভাবে এ কাজ করতে হয়। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি এ কাজ সঠিকভাবে করতে পারছ না।” অতঃপর নবীজি ﷺ তাঁর হাত ভেড়ার চামড়া আর মাংসের মাঝে রাখলেন এবং কাঁধ পর্যন্ত চামড়া ছাড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন, “এভাবে চামড়া ছাড়াতে হয়, হে যুবক।” অবশেষে তিনি প্রস্থান করলেন।

[৫৪] ইশারায় সালাম দেয়ার জন্য যেভাবে হাত তোলা হয়, সেভাবে।

[৫৫] সুন্নত তরিকায় হাত মিলানো

আমরা দেখতে পাই যে নবীজি ﷺ বিভিন্ন প্রজন্মের, ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হতেন। তিনি তাদের অবস্থার প্রতি মনোযোগী ছিলেন, তাদের জীবনের আনুষঙ্গিক জিনিসগুলোর ব্যাপারেও তিনি স্পষ্টভাবে আগ্রহ দেখাতেন। আমরা অবাক হয়ে ভাবি, সেই যুবকটি তখন এ কথা ভেবে কতই-না পুলকিত বোধ করছিল যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার ব্যক্তিগত সমস্যার ব্যাপারে এত আগ্রহ দেখাচ্ছেন আর তা সমাধানে আমাকে সাহায্যও করছেন!

একবার তিনি সাহাবীদের নিয়ে একজন সাহাবীর গৃহে অবস্থান করছিলেন। বিলাল রা. এসে বললেন, জামাতের সময় হয়ে গেছে। নবীজি ﷺ মসজিদের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে এক লোককে দেখলেন, সে বিশাল একটি কড়াই রান্নার জন্য চুলোতে চড়িয়েছে। নবীজি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “রান্না কি শেষ হয়ে গেছে?”

লোকটি জবাবে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল, এটি প্রস্তুত হয়ে গেছে।”

তখন নবীজি এক কামড় মুখে তুলে নিলেন এবং হাঁটতে হাঁটতে তা চিবোতে লাগলেন। নামায শুরু করার আগ পর্যন্ত তিনি তা চিবুচ্ছিলেন।

আমরা এসব ঘটনার দর্পণে নবীজির ব্যক্তিজীবনকে সবচেয়ে অনাড়ম্বর ও স্বতঃস্ফূর্তরূপে খুঁজে পাই। এভাবেই তিনি সাহাবীদের সাথে জীবনযাপন করতেন। ঘটনাটি আবার ভেবে দেখুন, তিনি একজনের কাছ থেকে এক কামড় খাবার মুখে নিলেন এবং হাঁটতে হাঁটতে তা চিবুতে লাগলেন। অহংকারী, দান্তিক লোকদের সাথে এ আচরণের কতই-না তফাত! যে ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি খাবার নিয়েছিলেন, সে এতে খুবই খুশি হয়েছিল। সম্ভবত ওইদিন সে যাকেই দেখেছে তাকেই বলেছে কীভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার খাবার থেকে এক লোকমা খাদ্য তুলে নিয়ে তারই সামনে মুখে পুরেছেন। এ ঘটনাটি যেন ওই ব্যক্তির জন্য একটা বিশেষ পুরস্কারের মতো। এ ধরনের অভূতপূর্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের দ্বারাই বোধহয় নবীজি ﷺ সাহাবীদের এত কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। কাউকে দেখতে গেলে নবীজি ﷺ কখনো দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না, ডানে বা বামে সামান্য সরে দাঁড়াতেন। তখনকার সময়ে ঘর ছোট ছিল, বাইরে কোনো পর্দা টানানো থাকত না। তাই দরজায় এসে দাঁড়িয়ে নবীজি ﷺ বলতেন, ‘আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্লাহ’। অর্থাৎ, আপনাদের ওপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বারাকাহ বর্ষিত হোক। প্রথমবার সালামের জবাব না মিললে তিনি মোট তিনবার সালাম দিতেন। এরপরেও জবাব না আসলে তিনি ফিরে যেতেন।

একদিনের ঘটনা। নবীজি ﷺ সাদ ইবনু উবাদাহ রা. কে দেখতে গেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ’। সাদ রা. সালাম শুনে আস্তে করে জবাব দিলেন, যাতে নবীজি তা শুনতে না পান। নবীজি ﷺ আবার সালাম দিলেন। সাদ রা. আবারও নীরবে জবাব দিলেন। নবীজি ﷺ আরও একটিবার সালাম দিলেন আর সাদ রা.-ও একই কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। নবীজি ﷺ চলে যেতে উদ্যত হলে তড়িঘড়ি করে সাদ রা. এসে দেখা দিলেন এবং বললেন, “যিনি আপনাকে সত্য বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছেন সেই মহান সত্তার শপথ, প্রত্যেকবার আপনি সালাম দিয়েছেন আর আমি তার জবাব দিয়েছি। আমি তো শুধু এটা চাচ্ছিলাম যে, আপনি যেন আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য রহমত, বরকত আর শান্তির দুআ করুন।”

চারপাশ পরিদর্শন

নবীজি ﷺ সকালের সময়টাতেই সাধারণত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি মাঝে মাঝে তাঁর কন্যা ফাতিমা রা. ও দৌহিত্র হাসান ইবনু আলি রা. কে দেখতে তাদের গৃহে যেতেন।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, “একদিন মধ্য-সকালে নবীজি ﷺ বের হলেন। তিনি আমাকে মসজিদে খুঁজে পেয়ে আমার হাত ধরলেন। আমিও তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। তিনি আমার হাতের ওপর ভর দিচ্ছিলেন। এভাবেই আমরা হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু কেউ কারও সাথে কথা বলছিলাম না। প্রথমে আমরা ইহুদী গোত্র বনু কায়নুকার বাজারে গেলাম। তিনি কিছুক্ষণ বাজারে ঘুরে সেখানে কী হচ্ছে তা অবলোকন করলেন। তারপর সেখান থেকে ফিরে এলেন। আমি আবারও তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। তিনি ফাতিমা রা. এর গৃহের উঠানে গিয়ে বসলেন। তারপর বললেন, ‘ছোট সোনামণিটি কোথায়? ছোট সোনামণিটি কোথায়? ছোট সোনামণিটি কোথায়? হাসান ইবনু আলিকে আমার কাছে আসতে বলো।’

তৎক্ষণাৎ ছোট হাসান রা. তড়িঘড়ি করে ছুটে এলেন। তিনি লাফ দিয়ে নবীজির কোলে গিয়ে বসলেন। তারা দুজন একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন। নবীজি ﷺ শিশু হাসানকে স্নেহভরে চুমু খেলেন এবং নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে রাখলেন। হাসান রা. তখন নবীজির দাড়িতে হাত বুলাতে লাগলেন। নবীজি ﷺ মুখ খুললেন আর হাসানও নিজের মুখ নবীজির মুখের ভেতর রাখলেন। নবীজি বললেন, ‘হে আমার রব, আমি তাকে ভালোবাসি; তাই তুমিও তাকে ভালোবেসো। যারা তাকে ভালোবাসবে তাদেরও তুমি ভালোবেসো।’ এই দুআ নবীজি তিনবার করলেন।”

আবু হুরায়রা রা. এই অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্যটি প্রায়ই স্মরণ করতেন। তিনি বলতেন, “যখনই আমি হাসানকে দেখি, আমার দু-চোখ আবেগে অশ্রুসিক্ত হতে শুরু করে।”

একদিন নবীজি ﷺ ফাতিমার ঘরে গিয়ে ফাতিমার স্বামী আলি রা. এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ফাতিমাকে প্রশ্ন করলেন, “তোমার চাচাতো ভাই কোথায়?” ৫৬

ফাতিমা রা. বললেন, “আমাদের মাঝে কিছু মনোমালিন্য হয়েছে। তাই তিনি বাইরে চলে গেছেন।” তখন নবীজি আলি রা. কে খুঁজতে লোক পাঠালেন। একটু পর খবর এল যে, আলি রা. মসজিদে ঘুমোচ্ছেন। নবীজি ﷺ মসজিদে গিয়ে দেখলেন যে, আলি রা. মাটিতে শুয়ে আছেন। আলি রা. এর গায়ের ওপরিভাগের জামা খুলে পাশে পড়ে আছে এবং শরীরে বালি লেগে আছে। তা দেখে নবীজি ﷺ নিজেই বালি ঝাড়তে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন, “উঠে পড়ো, ও আবু তুরাব, উঠে পড়ো, ও আবু তুরাব।” (তুরাব শব্দের অর্থ হচ্ছে বালু বা ধূলিকণা)

আমাদের নবীজি ﷺ উম্মে আইমানের ঘরে নিয়মিত যেতেন। নবীজি ﷺ যখন ছোট ছিলেন তখন উম্মে আইমান রা. নবীজিকে দেখাশোনা করতেন। একবার তিনি সেখানে গেলেন। উম্মে আইমান রা. কিছু খাবার বা পানীয় নিয়ে এলেন। নবীজি ﷺ সম্ভবত রোযা ছিলেন অথবা কোনো কারণে খেতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই কিছু না খেয়েই তিনি সেগুলো ফিরিয়ে দিলেন। উম্মে আইমান রা. এতে তীব্র আপত্তি জানিয়ে নবীজির দিকে এগিয়ে আসলেন, অসন্তুষ্ট হলেন, এমনকি গলাও চড়ালেন।

উম্মে আইমান রা. এ রকম করতে পারতেন তার মর্যাদার কারণে। যখন নবীজি ﷺ ছোট শিশু ছিলেন তখন তিনি তাঁর দেখভাল করতেন। তাই হয়তো, নবীজির প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ থেকেই তিনি এ রকম রাগ দেখাতেন; ঠিক যেমনটা কোনো মা তার সন্তানের সাথে করে থাকেন। সকল শান্তি ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যিনি বিনম্র মুচকি হাসির মাধ্যমে সবকিছু সহ্য করে যেতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরও দেখতে যেতেন। তিনি দুর্বল ও অসুস্থ সাহাবীদের মাঝে মাঝে দেখে আসতেন। তাদের দাওয়াত কবুল করতেন। কখনো তিনি একা যেতেন। একবার আনাস বিন মালিক রা. এর দাদি মুলাইকা রা. খাবার প্রস্তুত করে নবীজিকে দাওয়াত করলেন। নবীজি ﷺ দাওয়াত গ্রহণ করে সেখানে গেলেন এবং তা খেলেন। খাওয়া শেষে বললেন, ‘এখন উঠো, যাতে করে আমরা একসাথে সালাত পড়তে পারি।’ আনাস রা. বলেন, ‘আমি পুরোনো একটি খড়ের মাদুর তুলে নিলাম, যা দীর্ঘদিনের

[৫৬] আলী রা. আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও ফাতিমার চাচাতো ভাই বলে সম্বোধনের কারণ হচ্ছে আরবের প্রচলিত একটি সাধারণ পরিভাষা এটি। - ফাতহুল বারি- ২/৪৪২

ব্যবহারের কারণে কালচে হয়ে গিয়েছিল। এটির ওপর আমি সামান্য পানি ছিটিয়ে দিলাম। নবীজি ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং আমি তাঁর পেছনে একজন এতিম ছেলের সাথে দাঁড়িলাম। বৃদ্ধা মহিলা আমাদের পেছনের কাতারে দাঁড়ালেন। নবীজির ইমামতিতে দুই রাকাত সালাত পড়ার পর তিনি চলে গেলেন।”

তিনি মাঝে মাঝে দাওয়াত গ্রহণ করতেন এবং সেখানে পরিবারের সদস্যদেরও নিয়ে যেতেন। আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীজির এক পারসিক প্রতিবেশী ছিল, যার সুস্বাদু খাবার রান্নার জন্য বেশ নামডাক ছিল। আসলেই তার রান্না থেকে খুব মুখরোচক সুগন্ধ আসত। একদিন সে নবীজির জন্য কিছু খাবার রান্না করে এসে দাওয়াত করে বসল। নবীজি ﷺ বললেন, “আমি কি আয়িশাকে আমার সাথে নিয়ে আসতে পারি?”

লোকটি না-বাচক জবাব দিল। তখন নবীজি ﷺ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলেন। লোকটি আবার এসে দাওয়াত করল। নবীজি ﷺ বললেন, “সে (আয়িশা) আমার সাথে আসছে।” লোকটি আবার বলল, “না।” নবীজি আবার তার দাওয়াত ফিরিয়ে দিলেন। লোকটি তৃতীয়বার দাওয়াত দিতে আসলে তখন সন্মতি দিল। পরবর্তী সময়ে নবীজি ﷺ আয়িশাকে নিয়ে সেখানে খেতে গিয়েছিলেন।

একদিন একজন দর্জি নবীজি ﷺ-কে দাওয়াত দিল। দর্জিটি একটি গোত্রের মিত্র ছিল। আনাস রা. বলেন, “আমি আল্লাহর রাসূলের সাথে ভোজে অংশ নিলাম। সে (দর্জি) নবীজির সামনে কিছু যবের রুটি এবং লাউ ও শুকনো মাংস দিয়ে সিদ্ধ করা কিছু খাবার রেখে কাজে চলে গেল। নবীজি ﷺ লাউ খেলেন এবং তা পছন্দ করলেন। আমি দেখলাম তিনি থালা থেকে লাউ বেছে বেছে খাচ্ছেন। তা দেখে আমি আমার অংশের লাউগুলো না খেয়ে নবীজির পাতে তুলে দিলাম। এরপর থেকে আমি লাউ (খেতে) ভালোবাসি।” নবীজি ﷺ মাঝে মাঝে সাহাবীদেরও সাথে নিয়ে দাওয়াতে যেতেন। ইতবান ইবনু মালিক রা. এর ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে দেয়া যায়। ইতবান রা. আবেদন করলেন নবীজি যেন ‘ইতবানের বাসায় সালাত পড়ার জন্য আসেন। ইতবান রা. এভাবে বলেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আমার দৃষ্টিশক্তি মারাত্মক হ্রাস পেয়েছে। আমি আমার লোকদের সালাতে ইমামতি করাতাম। যখন বৃষ্টি হয়, আমার ও তাদের মাঝের উপত্যকাটি খুব দ্রুত ছুটতে থাকে (বলে মনে হয়) এবং আমি তাদের মসজিদে পৌঁছে সালাতে ইমামতি করাতে পারি না। আমার খুবই ভালো লাগবে যদি আপনি আমার ঘরে এসে সালাত আদায় করেন। তাহলে আপনি যে জায়গায় এসে সালাত পড়বেন (আমার ঘরের)

সেই জায়গাকে আমি আমার সালাত পড়ার (নির্ধারিত) স্থান বানিয়ে নেবা।” নবীজি ﷺ জবাবে বললেন, “ইনশাআল্লাহ, আমি আসবা।” ওইদিনই মধ্য-সকালে নবীজি ﷺ সেখানে গেলেন। আবু বকর, উমরসহ আরও কয়েকজন সাহাবীও তখন সাথে ছিলেন। নবীজি ﷺ ইতবান রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, “আমি তোমার ঘরের কোন স্থানে সালাত পড়ব বলে তুমি চাও?”

ইতবান রা. তখন একটি জায়গা দেখিয়ে দিয়ে সেখানে একটি খড়ের মাদুর বিছিয়ে দিলেন এবং মাদুরের কোনায় পানি ছিটিয়ে দিলেন। নবীজি ﷺ দুই রাকাত সালাতে ইমামতি করলেন। ইতবান রা. তখন তাদের আরেকটু সময় সেখানে অবস্থান করে কিছু খাদ্য গ্রহণের অনুরোধ করলেন, যা তিনি আগেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। নবীজি ﷺ আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন এবং তার প্রস্তুতকৃত খাবার খেলেন।

কেউ নিমন্ত্রণ জানালে তাকে খুশি করার জন্য নবীজি ﷺ অত্যন্ত সচেতন থাকতেন। তাঁর মহত্ব সবার জন্য সম্প্রসারিত ছিল। নবীজি ﷺ-এর উত্তম আখলাক আর চারিত্রিক মাধুর্য থেকে ছোট্ট শিশুরাও বঞ্চিত হতো না। আনাস রা. বলেন, “আখলাকের দিক দিয়ে নবীজি ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি সামাজিকতা রক্ষার তাকিদে আমাদের নিকটে আসতেন। আমার এক ভাই ছিল, যার বয়স তখন মাত্র তিন বছর। আমরা তাকে আবু উমাইর নামে ডাকতাম। নবীজি ﷺ আমাদের ঘরে আসলে তাঁর সাথে মজা করতেন, খেলতেন। একদিন তিনি এসে দেখলেন বাচ্চাটির মন খারাপ। তিনি আমার মাকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে উম্মে সুলাইম, আবু উমাইরের কী হয়েছে? তাকে খুব দুখী আর বিমর্ষ দেখাচ্ছে।”

তখন তিনি (উম্মে সুলাইম) জবাব দিলেন, “তার খেলার সাথি নুগাইর^[৫৭] মারা গেছে।” নবীজি ﷺ তখন আবু উমাইরের কাছে গেলেন, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “ও আবু উমাইর, কোথায় নুগাইর? ও আবু উমাইর, কোথায় নুগাইর?” (নবীজি এই কথাকে ছন্দের মাধ্যমে বলছিলেন যাতে আবু উমাইরের মন ভালো হয়ে যায়।)

মাহমুদ ইবনু আর-রাবি রা. বলেন, “আমাদের ঘরের পাশের কুয়া থেকে পানি তোলার জন্য একটি বালতি ছিল। আমার এখনো মনে আছে যে নবীজি ﷺ সেই বালতি থেকে সামান্য পানি নিয়ে আমার মুখ মুছে দিয়েছিলেন। তখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর

[৫৭] আরবিতে ‘নুগাইর’ বলতে চড়ুই পাখির মত ছোট পাখিকে বুঝায়

ছিল।”

প্রিয় পাঠক, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মনোরম ঘটনাটি শিশু মাহমুদকে কতটুকু মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি বহু বছর পরেও তা স্মরণে রেখেছিলেন। আমরা এটা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই যে, এত এত ব্যস্ততার মাঝেও নবীজি ﷺ কীভাবে একটি দুখী বাচ্চা শিশুর দুঃখ ঘোচাতে সমর্থ হতেন, তাকে তার ছোট পাখিটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন অথবা অন্য বাচ্চাদেরই-বা কীভাবে খুশি করতে পারতেন। কচি কচি বাচ্চারা কতই-না খুশি হয়তো হতো যখন তারা নবীজি ﷺ-কে তাদের নিকটে আসতে দেখতো। তাদের মাতাপিতাও কতই-না উৎফুল্ল হতেন যখন দেখতেন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের বাচ্চাকে পছন্দ করছেন।

যখন নবীজি ﷺ কোনো সাহাবাকে দেখতে যেতেন এবং তাদের গৃহে খাবার খেতেন, তখন তিনি তাদের জন্য এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য দুআ করতেন। একবার তিনি সাদ ইবনু উবাদাহ রা.-কে দেখতে গেলেন। সাদ রা. নবীজির সামনে কিছু রুটি আর তেল রাখলেন। তিনি তা খেলেন এবং বললেন :

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

“রোজাদার মানুষ যেন তোমার ঘরে ইফতার করে, আবিদ লোকজন যেন তোমার (ঘরের) খাবার খায়; আর ফেরেশতারাও যেন তোমার জন্য দুআ করে।” ৫৮

একবার নবীজি ﷺ বুসর ইবনু আবু বুসর রা.-কে দেখতে গেলেন। তার বাসার নিকটে গেলে বুসর এবং বুসরের স্ত্রী প্রিয়নবীকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন। তারা নবীজির বসার জন্যে একটি মখমলের কাপড় বিছিয়ে দিলেন। তারপর বুসর স্বীয় স্ত্রীকে খাবার নিয়ে আসতে বললেন। তখন তার স্ত্রী খাদ্যভর্তি একটি থালা আনলেন। তাতে ময়দা, মাখন, পানি ও লবণের সংমিশ্রণে বানানো একধরনের খাদ্য ছিল। নবীজি ﷺ তাদের সাথে নিয়ে সেখান থেকে খেলেন। থালায় কিছু খাদ্য অবশিষ্ট ছিল। নবীজি ﷺ তখন তাদের জন্য দুআ করলেন :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

“হে আমার রব, তাদের গুনাহ মাফ করে দিন, তাদের ওপর আপনার রহমত বর্ষণ করুন। বারাকাহ ও প্রচুর পরিমাণে রিযিক তাদের দান করুন।” ৫৯

একদিন নবীজি ﷺ জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রা.-কে দেখতে তার ঘরে গেলেন। জাবির রা. নিজের স্ত্রীকে বললেন, “আল্লাহর রাসূল দুপুর নাগাদ আসবেন। তুমি এমন কিছু করবে না যাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। তুমি কোনো কথা বলবে না এবং প্রশ্নও জিজ্ঞেস করবে না।”

তারপর তিনি নবীজিকে আপ্যায়ন করার জন্যে নিজের একটি মোটাতাজা ছাগল জবাই করলেন। পরবর্তী সময়ে যখন নবীজির সামনে খাদ্য পরিবেশন করা হলো তিনি জাবির রা. এর দিকে তাকিয়ে বললেন, “জাবির, মনে হচ্ছে তুমি জানতে যে, আমরা মাংস ভালোবাসি।”

নবীজি ﷺ সাথে সাহাবীদের সবাইকে নিয়ে খাদ্য গ্রহণ করলেন। যখন নবীজির চলে যাওয়ার সময় হলো তখন জাবিরের স্ত্রী ঘরের ভেতর থেকে নবীজিকে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্যে এবং আমার স্বামীর জন্যে দুআ করুন।”

নবীজি তখন বললেন, “তোমার ও তোমার স্বামীর ওপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।”

তারপরের ঘটনা। জাবির নিজ স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহর সাথে কথা বলতে মানা করিনি?”

জাবির রা. এর স্ত্রী কী জবাব দিয়েছিলেন, জানেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন, “আপনি কি মনে করেছেন যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আমার ঘরে নিয়ে আসবেন এবং তিনি (খাবার খেয়ে) এমনি এমনি চলে যাবেন অথচ আমি তাঁর কাছে আমার ও আমার স্বামীর জন্যে দুআ করার আবেদন জানাতে ব্যর্থ হব?”

এই মহৎ মানুষেরাই ছিলেন নবীজি ﷺ-এর মহান সহচরবৃন্দ। তারা প্রিয়নবীর কাছ থেকে দুআ ও বরকত গ্রহণ করে ধন্য হতে পেরেছিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের মাঝেই বসবাস করেছেন। এটা ছিল তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ।

ওপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, নবীজি ﷺ যখন সাহাবীদের ঘরে বেড়াতে আসতেন তখন বিষয়টি তাদের জন্যে অত্যন্ত খুশির উপলক্ষ্য হতো। নবীজির আগমন

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছিল মর্যাদার ব্যাপার, ছোটদের জন্য ছিল আদর-যত্ন পাওয়ার মোক্ষম সুযোগ আর সর্বোপরি তাদের সবার জন্যই তা পরিপূর্ণ বরকত নিয়ে আসত। পাশাপাশি নবীজি ﷺ এ সময়টাতে সাহাবীদের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। নবীজির অনন্য ও বিশুদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্যই ছিল সাহাবীদের অন্তরে সঠিক মূল্যবোধের অবস্থান পাকাপোক্ত করে দেয়া।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু রাবিআহ রা. থেকে বর্ণিত, “আমি যখন ছোট বালক ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ আমাদের দেখতে আসেন। আমি বাইরে গিয়ে খেলতে চাচ্ছিলাম। আমার মা তখন আমাকে বলেন, ‘আব্দুল্লাহ, এদিকে আসো, আমি তোমাকে কিছু জিনিস দেব।’

নবীজি ﷺ তখন মাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি তাকে কী দিতে চাও?’

মা জবাবে বললেন, ‘আমি তাকে কিছু খেজুর দিচ্ছি।’

নবীজি ﷺ বললেন, ‘যদি তুমি তা না দিতে তাহলে এই কথাটি তোমার আমলনামায় মিথ্যা হিসেবে লিপিবদ্ধ হতো।’”

লক্ষ করুন, নবীজি ﷺ কেমন করে একজন মা-কে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন, যাতে করে তিনি তার সন্তানের মনে দৃঢ়ভাবে সত্য কথা বলার মূল্যবোধের সঞ্চার ঘটাতে পারেন। সন্তানও তাই এ মূল্যবোধ সম্পূর্ণভাবে শিখতে পেরেছিল এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে বহু বছর পর হাদীসটিও বর্ণনা করতে পেরেছিল। এভাবেই প্রিয় পাঠক, আপনি এবং আমিও বিষয়টি শিখে ফেললাম।

আরেকবারের ঘটনা। নবীজি ﷺ সাদ ইবনু উবাদাহ রা. এর ঘরে তাশরিফ আনলেন। সাথে অন্যান্য সাহাবাগণও ছিলেন। বাশির ইবনু সাদ রা. তখন একটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন আমরা যেন আপনার প্রতি রহমতের দুআ করি। আমরা তা কীভাবে করব?” ৬০

নবীজি ﷺ কিছু সময়ের জন্যে চুপ হয়ে গেলেন। উপস্থিত কেউ কেউ তখন চিন্তা করছিল এ প্রশ্নটি যদি নবীজির সামনে তোলাই না হতো তবে ভালো ছিল। তারপর নবীজি ﷺ নীরবতা ভেঙে বললেন, “বলো :

[৬০] বাশির রা. এর প্রশ্ন ছিল আল কোরআনের একটি আয়াত প্রসঙ্গে। আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।” [সূরা আল আহযাব, ৩৩:৫৬]

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

‘হে আল্লাহ, তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করো, যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের ওপরে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ, তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের ওপর বরকত নাযিল করো যেমন বরকত তুমি নাযিল করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের ওপরে। অবশ্যই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।’ আর সালামের ব্যাপারটি তোমরা যেভাবে জানো সেভাবেই।” ৬১

নবীজির কিছুটা সময় চুপ থাকার ব্যাপারটি ভেবে দেখুন। সবাই উদ্গ্রীব হয়ে আকাশকুসুম কল্পনা করছিল। সবাই উত্তর জানার জন্য মুখিয়ে ছিল। আর তাই, যখন নবীজি ﷺ জবাব দিলেন, তারা সকলেই সাগ্রহে শিখে নিলেন, যাতে কেউ তা ভুলে না যায়। কল্যাণের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের ওপর সকল রহমত, বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক।

একবার নবীজি ﷺ ইতবান ইবনু মালিকের ঘরে ছিলেন। সেখানে তখন সাহাবীদের বেশ বড় জামাত উপস্থিত ছিল। একজন বললেন, “মালিক ইবনু আদ-দুকশুমের কী হয়েছে? তাকে দেখা যায় না।”

আরেকজন তখন জবাবে বললেন, “সে একটা মুনাফিক। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না।”

তখন নবীজি বারণ করে বললেন, “এ কথা বলবে না। তোমরা কী তাকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলতে শোনানি?”

যিনি এ কথা বলেছিলেন তিনি তখন বললেন, “আল্লাহ আর তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আমরা তো তাকে মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে ও কথা বলতে দেখি।”

নবীজি ﷺ বললেন, “যে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ তাঁর জন্য জাহান্নাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।”

ঘটনাটি পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। নবীজি ﷺ যখন সাহাবীদের দেখতে যেতেন তখন তিনি সে সময়টুকু সাহাবীদের, এবং সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহকে শিক্ষা দেয়ার কাজে কীভাবে ব্যবহার করতেন দেখুন। অন্য মুসলিমদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করার

শিক্ষা কত সুন্দরভাবেই-না তিনি দিচ্ছিলেন। মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে খারাপ কথা না বলার শিক্ষাও এ থেকে পাওয়া যায়। নববী পাঠশালা থেকে আমরা আরও শিখতে পারি যে, আমাদের সর্বদা মানুষের ইতিবাচক দিকটি বিবেচনায় রাখা উচিত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাস রাখা। এ ঘটনা থেকে এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। যার ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে সেই মানুষটি ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই’—এ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। নবীজি ﷺ শ্রোতাদের নজর তাই তো সেদিকেই ফিরিয়ে দিলেন।

ভাবুন তো, আমাদের মজলিস আর কথোপকথন কতই-না বিশুদ্ধতায় বদলে যাবে যখন আমরা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সাক্ষ্য দেওয়া মুমিনদের অনুপস্থিতিতে তাদের ব্যাপারে খারাপ কথা বলা থেকে বিরত থাকব।

অসুস্থ ব্যক্তির পাশে

আল্লাহর নবী ﷺ অসুস্থদের দেখতে যেতেন। কষ্ট-যাতনার দুঃসহ মুহূর্তগুলোতে প্রিয়নবীর উপস্থিতি যেন সাহাবাদের জন্য প্রলেপের কাজ করত, তাদের স্বস্তি জোগাত। যখন সাদ ইবনু উবাদাহ রা. অসুস্থ ছিলেন তখন নবীজি ﷺ তাকে দেখতে যান। সাথে ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনু আওফ, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। নবীজি ﷺ কক্ষে ঢুকে সাদ রা. কে অচেতন অবস্থায় পেলেন। পরিবারের সবাই তখন তাঁর পাশে। নবীজি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “সে কি মারা গেছে?”

তারা তখন জবাবে জানালেন, “না, সাদ এখনো মরেননি।”

এ সময় নবীজির চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গিয়েছিল। উপস্থিত সবাই নবীজিকে কাঁদতে দেখে কান্না শুরু করলেন।

তখন নবীজি ﷺ বললেন, “তোমরা কি শোনোনি যে, আল্লাহ কাউকে অশ্রুসজল দু-চোখের কারণে কিংবা ব্যথাকাতর অন্তরের জন্যে শাস্তি দেন না। তিনি শাস্তি দেন এই জিনিস (জিহ্বার দিকে দেখিয়ে) যা করতে পারে তার কারণে। নতুবা তিনি রহমত বর্ষণ করেন।”

নবীজি কতটুকু সহানুভূতিশীল ছিলেন তাঁর একটিমাত্র উদাহরণ এই ঘটনা। প্রিয়নবীর চোখ ভিজে গিয়েছিল শুধু তাঁর একজন সাহাবী জ্ঞান হারিয়েছেন এই কারণে। আমি অবাক হয়ে ভাবি, সাদ ইবনু উবাদাহ রা. এর কেমন লেগেছিল যখন জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর এবং সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তিনি এ কথা জেনেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ সাদ রা. কে দেখতে এসেছিলেন এবং তাঁর অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন। সাদ রা. এর ছেলেদের, স্বজনদের এবং সাহাবাদের এ দৃশ্য দেখে কেমন লেগেছিল? তারা তো দেখছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের কষ্ট আর দুশ্চিন্তাগুলোও ভাগ করে নিচ্ছেন।

তাদের মতো একই অনুভূতি নবীজিরও হচ্ছিল। এ রকমই ছিল নবীজির মমত্ববোধ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর নবীকে জানেন এবং তাঁর ব্যাপারে যথার্থই বলেছেন :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যা কিছু কষ্ট দেয় তা তাঁর নিকট খুবই কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু।” ৬২

এ ধরনের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রা. এর ঘটনা।

তিনি বলেন, “আমি অসুস্থ ছিলাম। নবীজি ﷺ আবু বকর রা. কে সাথে নিয়ে আমাকে দেখতে আসলেন। তখন আমার স্বগোত্রের (সালামাহ গোত্র) লোকেরা আমার পরিচর্যা করছিল। তাঁরা যখন হেঁটে আসছিলেন তখন আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। নবীজি ﷺ আমাকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখেন। আমি অচেতন ছিলাম। নবীজি ﷺ উযু করলেন এবং উযুর জন্য ব্যবহৃত কিছু পানি আমার ওপরে ছিটিয়ে দিলেন। আমি দ্রুত জ্ঞান ফিরে পেয়ে আল্লাহর রাসূলকে আমার পাশে দেখলাম। আমি তখন নবীজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আমার সম্পত্তি কীভাবে অছিয়ত করব? আমার তো সরাসরি উত্তরাধিকারী কেউ নেই। না আমার পিতা-মাতা আছেন আর না আছে সন্তান।’ নবীজি ﷺ আমার কথার জবাব দিলেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কুরআনের আয়াত নাযিল হলো। এ আয়াতে এ ধরনের অবস্থাতে উত্তরাধিকারের নিয়মকানুন বিবৃত হয়েছিল।”

আমরা জানি যে, জাবির রা., যিনি তখন অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন এবং নবীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, এ অবস্থায় মারা গেলে সম্পত্তি কীভাবে বণ্টন করবেন; তিনি নবীজির ওফাতের পরেও প্রায় ৭০ বছর জীবিত ছিলেন। আর এ দৃশ্য তার স্মৃতিতে সর্বদাই অমলিন ছিল।

আমরা জাবির রা. এর উক্তিটির ব্যাপারে আরেকটু গভীরভাবে ভেবে দেখি। তিনি বলেছিলেন, “আমি দ্রুত জ্ঞান ফিরে পেয়ে আল্লাহর রাসূলকে আমার পাশে দেখলাম।” তিনি হাদীসটি এমনভাবে বর্ণনা করছিলেন যেন তিনি এইমাত্র জ্ঞান ফিরে পেয়ে অবাক

হয়ে নবীজির দিকে তাকালেন।

এভাবেই নবীজি ﷺ-এর স্মৃতি চিরভাস্বর হয়ে ছিল সাহাবাদের মনে-মগজে। রোগ-শোক কিংবা দুর্বলতায় নবীজি ﷺ-কে পাশে পাওয়ার মতো আকুলতায় ভরা এ অনুভূতি আর কিছুতেই ছিল না। সাহাবাদের সাথে এমনই ছিলেন আমাদের নবীজি ﷺ। দুঃখের সময় তারা কখনো নবীজির অভাব বোধ করেননি; বরং সাহাবাগণ সব সময় নবীজি ﷺ-কে পাশে পেয়েছেন। তিনি সদা তাদের পাশে থেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। একইভাবে, আনন্দের সময়েও সাহাবাগণ নবীজি ﷺ-কে পাশে পেয়েছেন। তিনি সব সময় তাদের পাশে থেকে আনন্দও ভাগ করে নিতেন। তাই তো, সাহাবাদের ছিল নবীজি ﷺ-এর জন্য এত অসম ভালোবাসা।

মদীনার বাগানে

মাঝে মাঝে প্রাতঃভ্রমণের এ সময়টাতে নবীজি ﷺ মদীনার বাগানগুলোতে যেতেন। সেখানে তিনি সবুজ গাছের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন। অনেক সময় অন্তরঙ্গ অনেক সাহাবীদের সাথে সেখানেই দেখা হয়ে যেত। তিনি বায়রুহা নামক একটি বাগানে প্রায় যেতেন। বাগানটির মালিক ছিলেন আবু তালহা আল-আনসারি রা.। তিনি সেখানে গিয়ে গাছের ছায়ায় বসতেন এবং সেখানকার সুপেয় পানি পান করতেন। এ বাগানটি থেকে মসজিদে নববী ছিল উত্তর দিকে। বর্তমানে মসজিদ সম্প্রসারিত করার ফলে বাগানের স্থানটি মসজিদের ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

আনসারদের মালিকানাধীন অন্যান্য বাগানগুলোতেও কখনো কখনো প্রিয়নবী ﷺ সময় কাটাতেন। এ রকম একটি ঘটনা আমরা জানতে পারি আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে।

আবু হুরাইরা রা. বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসে ছিলাম। আমাদের সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর এবং আরও কয়েকজন সাহাবী। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সেখানে রেখে চলে গেলেন। তিনি দীর্ঘসময় অনুপস্থিত ছিলেন, সে জন্যে আমরা আশঙ্কা করছিলাম হয়তো তাঁর সাথে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটল কিনা! আমরা চিন্তিত হয়ে উঠে পড়লাম। সবার প্রথম দুশ্চিন্তা এসেছিল আমার, তাই আমি প্রথমে উঠে রাসূলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। আনসারদের একটি বাগানের সামনে এসে সেখানে ঢোকার প্রবেশপথ খুঁজতে লাগলাম। চারপাশ ঘুরেও কোনো দরজা পেলাম না। বাগানের ভেতরের একটি কুয়া থেকে ছোট্ট নালা দিয়ে বাইরে পানি আসছিল। আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নালার মধ্যে দিয়ে বাগানে ঢুকে পড়লাম, ঠিক যেভাবে খরগোশ ঢুকে থাকে। সেখানে প্রবেশ করে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে খুঁজে পেলাম। তিনি আমাকে “আবু হুরায়রা” বলে ডাকলেন। আমি বললাম, “জি, আল্লাহর রাসূল!” তারপর তিনি

আমাকে তাঁর জুতাজোড়া দিয়ে বললেন, “এই জুতাজোড়া নিয়ে বাইরে যাও। এই বাগানের বাইরে যার সাথেই তোমার দেখা হবে তাকে এ সুখবর জানিয়ে দিয়ো যে, কেউ যদি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ঘোষণা দেয়—‘আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই’-তাহলে সে জান্নাতে থাকবে।”

কুবার আগমন করলে নবীজি ﷺ কখনো কখনো সেখানকার আরিস নামক কুয়ার নিকটে যেতেন। এটি মাসজিদুল কুবার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এটি সেই কুয়া, যেখানে তৃতীয় খলিফা উসমান রা. এর খিলাফতকালে নবীজি ﷺ-এর আংটি পড়ে হারিয়ে যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এবং মুসলিম জনগণ এই কুয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। অবশ্য বর্তমানে এই কুয়াকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে।

আবু মুসা আল আশআরি রা. বর্ণনা করেন,

“একবার নবী ﷺ প্রয়োজনবশত মদীনার (দেয়াল ঘেরা) বাগানগুলোর একটি বাগানের উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমি তাঁর পেছনে গেলাম। তিনি যখন বাগানে প্রবেশ করলেন তখন আমি এর দরজায় বসে থাকলাম। দরজাটি শুকনো খেজুরের ডালপালা দিয়ে বানানো ছিল। আমি মনে মনে বললাম, আজ আমি নবীজি ﷺ-এর প্রহরীর কাজ করব। অবশ্য তিনি আমাকে এর নির্দেশ দেননি। নবীজি ﷺ ভেতরে গেলেন এবং স্ত্রীয় প্রয়োজন সেরে উঠে গেলেন। এরপর আরিস নামক কুয়ার পোস্তার (কুয়ার গাঁথুনি বা ঠেস) ওপর বসলেন এবং হাঁটুর নিচের অংশের কাপড় তুলে নিয়ে দু-পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এমন সময় আবু বকর রা. এসে তাঁর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, “আপনি অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ-না আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসছি।”

তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি নবীজি ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, “হে আল্লাহর নবী, আবু বকর আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন।”

তিনি বললেন, “তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।”

আবু বকর আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা করে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিনি নবীজির ডান পাশে কুয়ার ছোট দেয়ালে গিয়ে বসলেন। এরপর তিনিও হাঁটুর নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর উমর রা. আসলেন। আমি বললাম, “আপনি নিজ জায়গায় অপেক্ষা করুন। আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে

আসি।”

(অনুমতি প্রার্থনা করলে) নবীজি ﷺ বললেন, “তাকে আসার অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।”

তিনিও আল্লাহর হামদ ও শোকরগুজারী করে ভেতরে ঢুকলেন। তিনি নবীজির বামদিকে কুয়ার ছোট দেয়ালে বসলেন এবং হাঁটুর নিচের অংশ অনাবৃত করে দু-পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এতে কূপের পোস্তা পূর্ণ হয়ে গেল এবং সেখানে বসার আর কোনো স্থান অবশিষ্ট থাকল না। এরপর উসমান রা. আসলেন। আমি বললাম, “আপনি নিজ জায়গায় অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে না আসি।” নবীজি ﷺ বললেন, “তাকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে বিপদগ্রস্ত হওয়াসহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও।”

আমি তাঁর (উসমানের) কাছে গিয়ে বললাম, “ভেতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে এ খবর পাঠিয়েছেন যে, আপনি জান্নাতী। তবে (তার আগে) আপনাকে (দুনিয়ায়) নিদারুণ কষ্ট-যাতনার মধ্যে পড়তে হবে।”

জবাবে তিনি (উসমান) বললেন, “আমি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আমার রব, আমাকে বিপদের সময় অটল রাখুন।”

অতঃপর তিনিও ভেতরে গেলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বসার কোনো জায়গা পেলেন না। কাজেই তিনি উল্টো দিকে এসে তাঁদের মুখোমুখি হয়ে কুয়ার পাড়ে বসে গেলেন এবং হাঁটুদ্বয়ের নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কুয়ার ভেতরে ঝুলিয়ে দিলেন। আমি তখন আমার অন্য এক ভাইয়ের (আগমন) কামনা করছিলাম এবং আল্লাহর নিকট দূআ করছিলাম যেন সে (এ মূহূর্তে) আগমন করে।”

মদীনার জলবায়ু অত্যন্ত গরম হওয়ার দরুন ছায়ার খোঁজে নবীজি ﷺ মদীনার বাগানগুলোতে যেতেন, সেখানে বিশ্রাম নিতেন। এই বিশ্রাম নবীজিকে স্বস্তি ও শক্তি জোগাত, যাতে তিনি তাঁর বাকি দৈনন্দিন কাজগুলো সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন। বাগান-মালিকদের জন্যেও নিজেদের বাগানে প্রিয়নবী ﷺ-এর আগমন অত্যন্ত খুশির উপলক্ষ্য ছিল। তারা সানন্দে আল্লাহর রাসূলকে বরণ করে নিতেন। তারা এটি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহর রাসূলের উপস্থিতি তাদের বাগানে বরকত নিয়ে আসছে। তিনি তো বরকতময়, চাই যেখানেই তিনি থাকুন না কেন।

প্রিয়নবীর ক্বায়লুলা

সকালের শেষে যখন বেলা গড়াতে শুরু করত, তখন নবীজি ﷺ উন্মুল মুমিনীনদের মধ্যে যার ভাগে থাকার তারিখ থাকত তাঁর কক্ষে যেতেন। প্রবেশ করে প্রথমে তিনি যে-দুটি কাজ করতেন তা হচ্ছে মিসওয়াক করা এবং ঘরের সবাইকে সালাম দেয়া। তারপর দোহার সালাত ৩৩ আদায় করতেন। কখনো চার রাকাত পড়তেন, কখনো-বা বাড়িয়ে ছয় কিংবা আট রাকাত পড়তেন।

সকালে নাশতা না করে থাকলে সেখানে যদি খাবার পাওয়া যেত, তবে সামান্য কিছু খেয়ে নিতেন। এমনও হয়েছে যে, নবীজি ﷺ-কে রোযা থাকা অবস্থায় খাবার খেতে বলা হয়েছে আর তিনিও রোযা ভেঙে খাদ্য গ্রহণ করেছেন। ৬৪

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে পাওয়া যায়, তিনি একদিন নবীজি ﷺ-কে বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, একজন আগন্তুক আমাদের জন্য একটি উপহার পাঠিয়েছেন। আমি আপনার জন্য (তা থেকে) কিছু রেখেছি।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “কী জিনিস?”

আয়িশা রা. জানালেন, “সেটি হচ্ছে হাযসা।” ৬৫

নবীজি ﷺ তখন তা নিয়ে আসতে বললেন। আয়িশা রা. তা নিয়ে আসলে তিনি তা খেলেন। তারপর বললেন, “আমি রোযা অবস্থায় আমার দিন শুরু করেছিলাম।”

[৬৩] দোহা (الضحى) আরবী শব্দ। এর অর্থ পূর্বাহ্ন বা দিনের প্রথম অংশ (forenoon)। ফার্সী ভাষায় একে ‘চাস্ত’ বলা হয়। সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আরবীতে দোহা বলা হয়। সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে প্রায় ১৫/২০ মিনিট পরে দোহা বা চাস্তের সালাতের সময় শুরু। দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে কোনো সময়ে এ সালাত আদায় করা যায়। ‘দোহা’র সালাত দু রাক’আত থেকে বার রাক’আত পর্যন্ত আদায় করা যায়। তাহাজ্জুদ সালাতের পরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাসনুন নফল সালাত দোহার সালাত।

[৬৪] নফল রোযা এরকমভাবে ভাঙ্গা জায়েজ আছে। তবে হানাফী ফিকহ অনুসারে পরবর্তীতে ঐ রোযা অন্য কোন দিন কায্য করতে হবে।

[৬৫] একধরনের খাদ্য যা খেজুর, পান্তরিত মাখন আর পনিরের সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

শেষ সকালের এই সময়টাতেই নবীজি ﷺ উন্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়্যাহ রা. কে এসে দেখেছিলেন যে, তিনি তাঁর সালাতের স্থানে বসে আল্লাহর হামদ (প্রশংসা) করছিলেন। নবীজি ﷺ সেদিন ভোরে ফজরের সালাত সমাপ্ত করেও সেখানে এসে তাকে (জুয়াইরিয়্যাহকে) একই জায়গায় দেখেছিলেন। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আমি যে অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে বাইরে গেলাম, সে অবস্থাতেই তুমি রয়েছ।”

তিনি হ্যাঁ-বাচক জবাব দিলেন। নবীজি ﷺ তখন বললেন, “কিন্তু, তোমার নিকট থেকে যাবার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার পড়েছি। যদি সেগুলো তোমার সকাল থেকে (এ যাবৎ) পঠিত দুআর মোকাবিলায় ওজন করা যায়, তাহলে তা পরিমাপে সমান হয়ে যাবে। তা হচ্ছে এই :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ
كَلِمَاتِهِ

অর্থাৎ, “আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলের সমপরিমাণ মহাপবিত্র, আল্লাহ তাআলা তাঁর সন্তার সন্তোষ মোতাবেক মহাপবিত্র, আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশের ওজনের সমপরিমাণ মহাপবিত্র, আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামের সমান মহাপবিত্র।” ৩৩

এই সময়টা তিনি পরিবারের সাথে একান্তে কাটাতেন। এ সময় অন্য মুসলিমা নারীগণ তাদের দ্বীনি বিষয়ের সেসব প্রশ্নের উত্তর জানতে আসতেন, যা তারা অন্য পুরুষদের সামনে লজ্জাবশত নবীজিকে করতে পারতেন না। তারা নবীজিকে যখন প্রশ্ন করতেন তখন উন্মুল মুমিনীনগণ সেখানে উপস্থিত থাকতেন। এভাবেই আমরা নারীদের ব্যক্তিগত বিষয়াবলির ক্ষেত্রে দ্বীনের বিধানবলি জানতে পারি।

একবার নবীজি ﷺ আয়িশা রা. এর ঘরে ছিলেন। তখন এক আনসারি মহিলা এসে জিজ্ঞেস করলেন, “মাসিক শেষ হয়ে গেলে নারীরা কীভাবে ফরয গোসল করবে?”

নবীজি ﷺ তখন বললেন, “সে পানি এবং পরিষ্কার করার কাপড় সাথে নেবে এবং উষু করবে। তারপর মাথায় পানি ঢালবে এবং মাথা ভালোভাবে ঘষে নেবে; যাতে পানি চামড়ায় পৌঁছে যায়। তারপর সে এক টুকরো কস্তুরি লাগানো নেকড়া দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে নেবে।”

মহিলা বললেন, “এটি দিয়ে কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করব?”

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, “তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করো।”

মহিলা (তৃতীয়বার) বললেন, “কীভাবে?”

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, “সুবহানাল্লাহ, তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করো।” অতঃপর লজ্জাবশত অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

আয়িশা রা. বলেন, “যখন আমি রাসূলুল্লাহকে লজ্জাবোধ করতে দেখলাম, তখন আমি তাকে (আনসারি মহিলাকে) নিজের দিকে টেনে নিলাম এবং বললাম যে, তুমি এটি দিয়ে তোমার রক্ত বের হওয়ার জায়গায় ঘষবে। তিনি (নবীজি) আমার কথা শুনলেন এবং প্রতিবাদ করলেন না।”

একদা নবীজি ﷺ উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা রা. এর সাথে ছিলেন। তখন উম্মু সুলাইম রা. এসে প্রশ্ন করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, কোনো মহিলা যদি স্বপ্নে দেখে যে সে স্বামীর সাথে সহবাস করছে তবে কি তাকে গোসল করতে হবে?”

তখন উম্মু সালামা রা. বললেন, “হায় হায়! উম্মু সুলাইম! তুমি তো আল্লাহর রাসূলের সামনে মহিলাদের উন্মোচিত করে ফেললে।”

উম্মু সুলাইম জবাবে বললেন, “আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না। আমাদের সমস্যাবলির ব্যাপারে নবীকে জিজ্ঞেস করা আমাদের জন্য গাফেল থাকার চেয়ে উত্তম।”

নবীজি ﷺ উম্মু সুলাইমকে সমর্থন করে স্বীয় পত্নী উম্মু সালামাকে বললেন, “তোমাকেই বরং বলা উচিত, হায়! তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ, যারা উদ্বিগ্নকারী বিষয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করে। হ্যাঁ, উম্মু সুলাইম, সে যদি বীর্য দেখে তবে তাকে অবশ্যই গোসল করে নিতে হবে।”

উম্মু সালামা রা. হাসলেন এবং বললেন, “আল্লাহর রাসূল, মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়?”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তা না হলে সন্তান তার মতো কীভাবে হয়?”

আনসারি মহিলাগণ প্রশ্ন করার ব্যাপারে রাখঢাক করতেন না, স্পষ্ট জবাব জানতে চাইতেন। আয়িশা রা. বলেন, “আনসারি মহিলাগণ হচ্ছেন উত্তম নারী। লজ্জাবোধ তাদের দ্বিনি জ্ঞান লাভে বাধা দিতে পারে নি।” ৬৭

[৬৭] হায়েযের গোসল সংক্রান্ত হাদীসের শেষ অংশে তিনি এ কথা বলেছিলেন

মাঝে মাঝে এ সময়টাতে ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণ এসে নবীজির সাথে দেখা করতেন; বিশেষত যখন কোনো ঘটনা ঘটত। একবার নবীজি ﷺ বিছানায় শুয়ে ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল আয়িশা রা. এর একটি কাপড়। ৬৮ নবীজির উরু অথবা পায়ের নিম্নভাগ দেখা যাচ্ছিল। আবু বকর রা. এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হলো, নবীজি আগের অবস্থানেই থাকলেন। তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণ করে চলে গেলেন। উমর রা. এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে নবীজি ﷺ তাকেও অনুমতি দিলেন। তখনো নবীজি ﷺ আগের অবস্থাতেই ছিলেন। উমর প্রয়োজন পূরণ করে প্রস্থান করলেন। তারপর উসমান রা. এসে কক্ষে ঢোকান অনুমতি চাইলেন। তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার আগে উঠে বসে কাপড় ঠিকঠাক করে নিলেন। তারপর উসমান ভেতরে আসলেন, নবীজির সাথে কথা বলে যে প্রয়োজনে এসেছিলেন তা পূর্ণ করে চলে গেলেন। আয়িশা রা. বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আবু বকর আসলেন কিন্তু আপনি কোনো কিছু ঠিকঠাক করলেন না। তারপর উমর আসলেন এবং আপনি আগের মতোই থাকলেন। কিন্তু উসমান আসার আগে আপনি উঠে বসে নিশ্চিত হয়ে নিলেন যে, আপনার কাপড় ঠিকঠাক আছে কি না!”

নবীজি ﷺ তখন বললেন, “আমি এমন লোকের সামনে এভাবে যেতে লজ্জাবোধ করলাম, যার উপস্থিতিতে ফেরেশতারাও লজ্জাবোধ করেন। উসমান একজন লজ্জাশীল ব্যক্তি। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে, আমি যদি আগের অবস্থাতেই থাকি তাহলে তার লজ্জা তাকে আমার কাছে তার দরকারের কথা বলতে বাধা দেবে।”

ঘরের ভেতর স্ত্রীর সাথে নবীজি ﷺ কীরূপ ছিলেন তা বর্ণনা করে গেছেন আয়িশা রা.। তিনি বলেন, “যখন তিনি ঘরে একান্তে থাকতেন তখন তিনি ছিলেন সবচেয়ে সহজ-সরল ও উদার মানুষ। তিনি তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছিলেন; তবে তিনি প্রায়ই মুচকি হাসতেন। তিনি অন্য মানুষদের থেকে আলাদা ছিলেন না। তিনি সব সময় পরিবারের প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। তিনি নিজের জুতা এবং কাপড় নিজে সেলাই করতেন, নিজ হাতে ছাগলের দুধ দোয়াতেন এবং নিজের খাবার নিজেই পরিবেশন করতেন। তিনি ঘরে তা-ই করতেন, যা যেকোনো পুরুষ মানুষ করে থাকে।”

প্রিয় পাঠক, আপনারা এখানেও দেখতে পারবেন নবীজির ব্যক্তিজীবনে ধার্মিকতার

[৬৮] এখানে এমন ধরনের কাপড়ের কথা বলা হচ্ছে যা নারী-পুরুষ উভয়েই পরতে পারে। পুরুষরা এধরনের কাপড় শরীরের উপরিভাগ বা নিম্নভাগে পরতে পারে।

মেলবন্ধন। নবীজির ঘর বলতে প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য ছোট একটা কক্ষ। ঘরের কাজ খুব অল্পই ছিল, যাতে তাঁর স্ত্রীদের সাহায্য করার দরকার পড়ত। তবুও তিনি গৃহস্থালি কাজে সহায়তা করতেন। প্রকৃতপক্ষে, নবীজি ﷺ পরিবারের মানুষজন যে কাজই করতে থাকেন না কেন, তা ভাগ করে নিতেন। যাতে করে পরিবারের সবাই এটা অনুধাবন করতে পারে এই ঘর পরিবারের সব সদস্যের ঘর এবং তারা একই সাথে জীবন কাটাচ্ছেন। এভাবেই নবীজি ﷺ পারিবারিক জীবনে মানসিক প্রশান্তির শিখরে পৌঁছে যেতেন। ঘরের ভেতর নবীজির কার্যাবলি আমাদের অনেকগুলো সুন্দর বার্তা প্রদান করে : একজন স্বামী স্ত্রীর কতটুকু যত্ন নেবে তা আমরা জানতে পারি; নবীজি ﷺ পারিবারিক জীবনকে কতটুকু গুরুত্ব দিতেন তাও জানা যায়। সকল কল্যাণ তাঁর তরে, যিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, যিনি নিজের পরিবারের মানুষদের কাছেও ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

নবীজির সংসারে যেমন ভালোবাসা ও মমত্ববোধের প্রাচুর্য ছিল; ঠিক তেমনি সংসারে নির্মল বিনোদনেরও কমতি ছিল না। আনন্দঘন স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের উপলক্ষ্যও নবীপরিবারে আসত। একদিন উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা. এর ঘরে উম্মুল মুমিনীন সাওদা রা. বেড়াতে আসলেন। নবীজি ﷺ উভয় স্ত্রীর মাঝে বসে ছিলেন। আয়িশা রা. হারিরাহ রান্না করেছিলেন, এটি একধরনের ঘন সুপ-জাতীয় খাবার, যা আটা দিয়ে বানানো হয়ে থাকে। তিনি তাঁর রান্না করা এ খাবার সাওদাহ রা.-কে খেতে দিলেন, কিন্তু সাওদাহ রা. বললেন, “আমার এটি পছন্দ নয়, আমি খাব না।”

তখন আয়িশা রা. বললেন, “তুমি এটি খাবে, নতুবা তা আমি তোমার মুখে ছুড়ে মারব।” সাওদাহ রা. তবুও খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আয়িশা কিছু খাদ্য হাতে তুলে নিয়ে তা সাওদাহ রা. এর মুখে মেখে দিলেন। নবীজি ﷺ হেসে সাওদাহ রা.-কেও প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ করে দিলেন। তিনি পাত্র থেকে কিছু খাদ্য তুলে সাওদাহ রা.-কে দিয়ে বললেন, “তুমিও তার মুখে মেখে দাও।”

সাওদাহ রা. তখন তা নিয়ে আয়িশা রা. এর মুখে মেখে দিলেন। নবীজি ﷺ তাদের শিশুসুলভ কাণ্ডকারখানা দেখে হাসতেই থাকলেন। তারা তিনজনই যখন হাসছিলেন তখন হঠাৎ মসজিদ থেকে উমর রা. এর গলা শোনা গেল। উমর রা. হাঁক দিয়ে নিজের ছেলেকে ডাকছিলেন, “ওহে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর!”

নবীজি ﷺ তখন তাঁর স্ত্রীদের বললেন, “যাও, মুখ মুছে আসো। উমর সম্ভবত আসতে

চাচ্ছেন।”

উমর রা. নবীজির দরজার নিকটে এসে বললেন, “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আপনাদের সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি কি আসতে পারি?”

নবীজি ﷺ ভেতরে ঢোকান অনুমতি দিলেন।

এ ধরনের বিনোদনপূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশ ইসলামী সংসারজীবনের স্বাধীনতা ও অকপট চরিত্রের দিকেই ইশারা প্রদান করে, যা নবীজি ﷺ বাস্তবায়ন করে গেছেন। আমাদের ধর্ম বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে।

যুহরের সালাতের আগ পর্যন্ত হালকা একটু ঘুমিয়ে নেয়া নবীজির অভ্যাস ছিল। তিনি সাধারণত নিজের ঘরেই ঘুমাতে। নিজ স্ত্রীগণের ঘর ব্যতীত অন্য কোনো মহিলার ঘরে তিনি কখনো ঘুমাননি, তবে ব্যতিক্রম ছিলেন উম্মু সুলাইম। তিনি মাঝে মাঝে উম্মু সুলাইমের ঘরে যেতেন এবং সেখানে ঘুমাতে। নবীজিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, “আমি তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁর ভাই আমার সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন।” ৬৯

এমনও হয়েছে যে নবীজি উম্মু সুলাইমের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, কিন্তু উম্মু সুলাইম ঘরে ছিলেন না। একবার উম্মু সুলাইম রা. বলেন যে, তিনি ঘরে গিয়ে দেখলেন নবীজি ﷺ ঘুমিয়ে আছেন। তখন গরমের সময় ছিল, নবীজি ﷺ দরদর করে ঘামছিলেন। তিনি এত বেশি ঘামছিলেন যে, তা বিছানার ওপরে রাখা এক টুকরো চামড়ায় গিয়ে জমা হচ্ছিল। উম্মু সুলাইম রা. নবীজির ঘাম জমা করে বোতলে ভরে নিলেন। নবীজি ﷺ ঘুম থেকে উঠে তা দেখতে পেয়ে উম্মু সুলাইমকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি এসব কেন করছেন? উম্মু সুলাইম জবাব দিলেন, তিনি নবীজির ঘাম জমা করে বোতলে ভরে রাখছেন, যাতে বরকতের জন্য এই ঘাম মোবারক তিনি নিজ সন্তানদের দিতে পারেন। তখন নবীজি ﷺ সম্মতি জানিয়ে তাদের জন্য দুআ করলেন।

[৬৯] আলিমগণ একমত যে নবীজি সা. উম্মু সুলাইমের ঘরে যেতেন; কারণ, উম্মু সুলাইম রা. নবীজির মাহরাম আত্মীয় ছিলেন। তবে আলিমগণের মধ্যে বিয়ে হারাম হওয়ার কারণ নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম নববী রাহ. বলেছেন, “উম্মু সুলাইম এবং তাঁর বোন উম্মু হারাম নবীজির খালা ছিলেন। তারা রক্তসম্পর্কের কারণে অথবা রাহ্মার (শিশু অবস্থায় দুগ্ধপানের) কারণে নবীজির মাহরাম ছিলেন।” – আন নববী, শারহ সাহীহ মুসলিম, খণ্ড ১৩।

গন্তব্য যখন কুবা

প্রতি শনিবারের মধ্য-সকালে আমাদের প্রিয়নবী ﷺ কুবায় যেতেন; তিনি কখনো হেঁটে আবার কখনো-বা বাহনে চড়ে যেতেন। সেখানে মসজিদ আল কুবায় তিনি সালাত আদায় করতেন। কুবার অধিবাসীরা আওফ ইবনুল হারিছের গোত্রভুক্ত ছিল। তারা নবীজিকে সে সময় দেখতে আসত, অভ্যর্থনা জানাত।

কুবায় গেলে নবীজি ﷺ উম্মু হারাম বিনতে মিলহান রা. এর ঘরে অবস্থান করতেন, সেখানে ক্বায়লুলা করতেন। উম্মু হারাম হচ্ছেন উম্মু সুলাইমের বোন। তারা উভয়েই নবীজির মাহরাম ছিলেন। একবার নবীজি ﷺ উম্মু হারামের ঘরে গিয়ে কিছু খাবার গ্রহণ করলেন এবং তারপর সেখানে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর মুচকি হেসে জাগ্রত হলেন। হযরত উম্মে হারাম রা. জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কেন হাসছেন?”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমার উম্মতের কিছু লোক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তারা সমুদ্র সফর করবে এমনভাবে, যেভাবে বাদশাহগণ সিংহাসনের ওপর উপবিষ্ট থাকে।”

হযরত বিনতে মিলহান আরজ করেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর নিকট দোআ করুন, যেন আমাকেও তাদের মধ্যে शामिल করে দেন।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, “হে আল্লাহ, বিনতে মিলহানকে তাদের মধ্যে शामिल করে দেন।” তিনি পুনরায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন এবং মুচকি হাসি দিয়ে জাগ্রত হলেন। হযরত বিনতে মিলহান রা. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, এবার স্বপ্নে কী হলো?”

তিনি ﷺ বললেন, “এবার স্বপ্নে দেখলাম, আমার উম্মতের অপর এক জামাতের অবস্থা, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।”

হযরত বিনতে মিলহান আবার আরজ করলেন “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জন্য দুআ করে দিন যেন আমাকে সেই জামাতেও অন্তর্ভুক্ত করে দেন।”

আল্লাহর রাসূল বললেন, “তুমি প্রথম জামাতে শামিল থাকবে (দ্বিতীয় জামাতে নয়)।”

বিনতে মিলহানকে নিয়ে করা নবীজির ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তী সময়ে সত্য প্রমাণিত হয়। মুয়াবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান রা. সাইপ্রাস দ্বীপে অভিযান পরিচালনা করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। স্বামী উবাদাহ ইবনে সামিত রা. এর সাথে বিনতে মিলহানও সেই বাহিনীতে যুক্ত হয়ে সমুদ্র সফর করেন। সাইপ্রাস অবতরণের পর তিনি তাঁর সওয়ারি (বাহন) থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং শাহাদাত বরণ করেন। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

মধ্য-আরবের ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে বসে নবীজি ﷺ কতই-না অভূতপূর্ব ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন! তাও এমন একটা সময়ে যখন মুসলিম উম্মত অভাব আর দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। আর তখন কিনা আল্লাহর রাসূল তাঁর সাহাবিয়াতকে (মহিলা সাহাবী) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন যে মুসলমানগণ একসময় ভূমধ্যসাগরে সমুদ্র অভিযান পরিচালনা করবে! শুধু তা-ই নয়, তারা তখন থাকবে এমন শক্তিশালী আর গৌরবান্বিত অবস্থায়, যেভাবে বাদশাহগণ সিংহাসনের ওপর উপবিষ্ট থাকেন।

পাঠক, আপনারা হয়তো জানেন না, ভূমধ্যসাগর মদীনা থেকে অনেক দূরবর্তী একটি সাগর। আমরা যে সময়ের কথা বলছি সে সময় সমুদ্রযাত্রার ব্যাপারটাই আরবদের জন্য অলীক কল্পনা ছিল; সমুদ্রে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করা তো অনেক দূরের কথা।

কোন জিনিসটা বেশি চমকপ্রদ ছিল? সকল সম্ভাবনা, প্রত্যাশা এবং আশেপাশের পরিস্থিতির বিপরীতে নবীজির এমন বিস্ময়কর খবর প্রদান করা নাকি বিনা বাক্যব্যয়ে নিশ্চয়তার সাথে উম্মু হারামের সেই খবর গ্রহণ করে নেয়া? উম্মু হারাম রা. নবীজিকে কোনো প্রশ্ন করেননি, সন্দেহ পোষণ করেননি, জিজ্ঞেস করেননি যে, মুসলমানদের এমন নাজুক পরিস্থিতিতে এটা কীভাবে সম্ভবপর হবে! তিনি তো এটিও জিজ্ঞেস করেননি যে, এ ঘটনা কখন সংঘটিত হবে। তিনি সোজাসাপ্টাভাবে নবীজির কাছে আরজ করে বসলেন, নবীজি ﷺ যেন দুআ করে দেন যাতে তিনি নিজে সে বাহিনীতে শামিল হতে পারেন। উম্মু হারাম রা. যেন চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটতে দেখছিলেন। এমনই ছিল সাহাবীদের ঈমান। রাব্বিয়াল্লাহু আনহুম।

পড়ন্ত দুপুরে

নবীজি ﷺ যদি যুহরের আগে ঘুমে থাকতেন তবে বিলালের রা. আযান শুনে জাগ্রত হয়ে যেতেন। তারপর তিনি আযানের শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে আযানের জবাব দিতেন। যদি প্রয়োজন মনে হতো তাহলে তিনি তখন উয়ু করে নিতেন। তারপর ঘরের মধ্যেই যুহরের চার রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায় করতেন। তিনি বলতেন, “এটা এমন একটা সময় যখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আর আমি পছন্দ করি তখন যেন আমার একটা ভালো আমল সেখানে পেশ করা হয়।”

জামাতের সময় হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ﷺ বাসাতেই অপেক্ষারত থাকতেন। এই সময়টাতে মাঝে মাঝে তিনি নাতি-নাতিদের সাথে খেলতেন। ফাতিমা রা. এর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন রা. এবং যাইনাব রা. এর কন্যা উমামাহ রা. হয়তো সেখানে প্রিয়নবীকে সঙ্গ দিতেন। বিলাল এসে যখন জানাতেন যে, সালাতের সময় হয়েছে, তখন নবীজি বাইরে বেরিয়ে আসতেন। সালাতে যাওয়ার আগে তিনি কখনো নিজ স্ত্রীদের চুমু খেতেন। নবীজিকে বেরিয়ে আসতে দেখলে বিলাল রা. সালাতের ইকামাত দিতেন। সাহাবাগণও প্রিয়নবীর আগমানে সালাতের জন্য উঠে দাঁড়াতেন।

তারা হয়তো অবাক হয়ে লক্ষ্য করতেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ হাসান, হুসাইন বা উমামাহকে কাঁধে করে নিয়ে সালাতের জন্য এসেছেন। ইমামতি করার সময় তিনি হয়তো তাদের পাশে বসিয়ে রাখতেন।

একবারের ঘটনা। তিনি হাসান বা হুসাইনকে কোলে নিয়ে সালাতের জন্য এগিয়ে গেলেন। নাতিকে পাশে বসিয়ে তিলি সালাত শুরু করলেন। সালাতে নবীজি ﷺ একটি সিজদা অনেক বেশি দীর্ঘ করলেন। সাহাবী শাদ্দাদ ইবনুল হাদ রা. সিজদাহ থেকে সামান্য মাথা তুলে দেখলেন যে, হাসান বা হুসাইন নবীজির পিঠে চড়ে বসেছে। সালাত শেষে সাহাবীগণ নবীজিকে শুধালেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আপনি একটি সিজদা

অনেক বেশি লম্বা করেছিলেন। আমরা তো ভেবেছিলাম আপনার কিছু হয়েছে অথবা আপনার ওপর ওহী নাযিল হচ্ছে।” নবীজি ﷺ তখন বললেন, “না, এ রকম কিছুই হয়নি। আমার ছেলে (নাতি) আমার পিঠে চড়ে বসেছিল আর সে নিজে নিজে নেমে আসার আগে আমি তাকে তাড়া দিতে চাইনি।”

নবীজি ﷺ হয়তো ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়েই সালাত শুরু করে দিতেন। রুকুতে যাওয়ার সময় তাদের নামিয়ে রাখতেন। আবার উঠে দাঁড়ানোর বেলায় তাদের কোলে তুলে নিতেন। নবীজি ﷺ নিজের নাতনি উমামাহ বিনতে যাইনাবকে সাথে নিয়ে এভাবে সালাত আদায় করেছেন।

ওয়াক্তের শুরুতে যুহরের সালাত আদায় করে নেয়া নবীজির অভ্যাস ছিল। প্রথম দুই রাকাতে তিনি প্রায় ৩০ আয়াতের মতো তিলাওয়াত করতেন। প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাতের চেয়ে দীর্ঘ হতো। তিনি এ সালাত এত দীর্ঘ করতেন যে, ইকামাত হয়ে যাওয়ার পর কেউ যদি ‘আলবাক্বি’ নামক স্থানে নিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে তারপর নিজ বাসায় গিয়ে উযু করে মসজিদে ফিরে আসতেন, তবুও নবীজিকে প্রথম দুই রাকাতের মধ্যেই পেয়ে যেতেন। যুহরের সালাতে নবীজি ﷺ মনে মনে তিলাওয়াত করতেন, তাঁর দাড়ির নড়াচড়া দেখে সাহাবীগণ বুঝে নিতেন যে তিনি তিলাওয়াত করছেন। মাঝে মাঝে তারা নবীজিকে একটি বা দুটি আয়াত জোরে তিলাওয়াত করতেও শুনতেন।

সালাতের পর নবীজি ﷺ সাহাবাদের দিকে মুখ করে বসতেন। কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটলে বা অপ্রীতিকর কোনো অবস্থার সৃষ্টি হলে এ সময়টাই ছিল সাহাবাদের সাথে নবীজির সাক্ষাতের সময়। কারণ, এ সময়টাতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মুসল্লি উপস্থিত থাকতেন। দুপুরের ঘুমের পর সবাই সতেজ থাকতেন বিধায় তারা তখন নবীজির কথা পূর্ণ মনোযোগের সাথে অনুধাবন করতে পারতেন।

একবার এই সময়ে ‘মুদার’ গোত্র থেকে প্রতিনিধিদল আসল। তারা এত বেশি দারিদ্র্য আর অনাহারে ভুগছিল যে, তা দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বিচলিত হয়ে পড়লেন। যুহরের সালাতের পর তিনি মিস্বরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সবার উদ্দেশে কথা বলা শুরু করলেন। আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা দ্বারা বক্তব্য শুরু করে অতঃপর তিনি বললেন, “আল্লাহ তাঁর কিতাব আল-কুরআনে নাযিল করেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

‘হে মনুষ্য-সমাজ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটিমাত্র ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দুজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (হক) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।’ ৭০

তিনি আরও বললেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্যে সে কী প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাকো। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা’আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।” ৭১

নবীজি ﷺ বলতে থাকলেন যে, কেউ চাইলে নগদ অর্থ দান করতে পারে; অল্প হোক কিংবা বেশি। অথবা কেউ চাইলে কাপড় বা তার অংশ থেকে কিছু ময়দা বা খেজুরও দান করে দিতে পারে। তিনি এভাবে বলেই যাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে এসে বললেন, কেউ চাইলে একটি খেজুরের অর্ধেকও যদি সাদাকা করতে চায়, করতে পারে। তিনি সবাইকে সাদাকা করতে উৎসাহিত করছিলেন। অনুপ্রেরণা দিচ্ছিলেন, সবাই যাতে সাদাকা নিয়ে এগিয়ে আসেন।

একবার নবীজি ﷺ ইবনু আল লুতবিয়াহকে রা. যাকাত আদায়ের কাজে প্রেরণ করলেন। তিনি ফিরে এসে জানালেন, “হে আল্লাহর রাসূল, এগুলো আপনাকে দেয়া হয়েছে আর এটি আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে।” নবীজি ﷺ সেদিন যুহরের সালাতের পর সবার উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করলেন। শুরুতে আল্লাহর এককত্বের ঘোষণা দিলেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা আর শোকরের মাধ্যমে বক্তৃতা শুরু করলেন। তিনি বললেন,

[৭০] সূরা নিসা, ৪:১

[৭১] সূরা হাশর, ৫৯:১৮

“তোমাদের কাউকে আমি হয়তো কোনো একটি কাজের দায়িত্ব প্রদান করে পাঠালাম। তখন কর্মচারীর জন্য এটি সমীচীন নয় যে, আমি তাকে কর্মচারী নিয়োগ করে পাঠাব, আর সে ফিরে এসে বলবে, এই মাল তোমাদের এবং এই হাদিয়া আমাকে দেওয়া হয়েছে। যদি সে তার পিতার বা মাতার গৃহে বসে থেকে দেখতে যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কি না? সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু গ্রহণ করো, যা নেয়ার অধিকার তার নেই, তাহলে সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি তা উট হয়, তবে সে উটের আওয়াজ করতে থাকবে। যদি বলদ অথবা গাভী হয়, তখন সে গরুর মতো হান্সা-হান্সা ডাক দিতে দিতে আসবে। আর যদি বকরি হয়, তবে তাও বকরির মতো ডাকতে থাকবে। আমি সে ডাক শুনে তাকে চিনতে পারব। এরপর তিনি তাঁর দু-হাত (দুআর জন্য) এত ওপরে উঠালেন যে, আমরা তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি বলেন, ইয়া রব্বি, আমি কি (তোমার হুকুম) পৌঁছে দিয়েছি? ইয়া রব্বি, আমি কি (তোমার নির্দেশ) পৌঁছে দিয়েছি?” ৭২

একদিন যুহরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিন্বারে উঠে দাঁড়িয়ে কিয়ামত দিবসের আলামতের ব্যাপারে কথা বলা শুরু করলেন। তিনি বললেন যে, শেষ জামানায় মারাত্মক-সব ঘটনা সংঘটিত হবে। তারপর তিনি বললেন, “যে কেউ আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়, সে যেন সামনে এগিয়ে আসে। আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ আমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছি, ততক্ষণ তোমরা আমাকে যে প্রশ্নই করো, আমি তার জবাব দেব।” অধিকাংশ উপস্থিত সাহাবায়ে কেবলমাত্র তখন কাঁদছিলেন। নবীজি ﷺ কারও প্রশ্ন থাকলে তা করার কথা কয়েকবার বললেন। তখন সাহম গোত্রের আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাইফা রা. উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “ও আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা কে?”

আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাইফার একবার কিছু লোকের সাথে ঝগড়া হয়েছিল। সে লোকগুলো দাবি করে তিনি হুযাইফার পুত্র নন। তাই তিনি রাসূলুল্লাহকে এ প্রশ্ন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ জবাব দিলেন, “তোমার পিতা হচ্ছে হুযাইফা।”

নবীজি ﷺ যখন বারবার কারও প্রশ্ন থাকলে তা করার জন্য বলছিলেন, তখন উমর রা. বসে পড়লেন এবং বললেন, “আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।”

তারপর নবীজি ﷺ একই কথার পুনরাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হলেন। অতঃপর বললেন, “আওলা^{৭৩} শপথ সেই সত্তার, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, একটু আগে এই দেয়ালের বিপরীতে আমাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা অল্পই হাসতে আর অনেক বেশি কাঁদতো।”

এ কথা শুনে সাহাবীগণ কেউ কেউ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের কান্নার রোল আসতে লাগল। এটি ছিল আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের জন্য সবচেয়ে কঠিন একটি দিন।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহাবীদের কোনো কথা পৌঁছল। অতঃপর তিনি ভাষণ দিয়ে বললেন, “আমার নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হলো। ফলে আমি আজকের মতো ভালো ও মন্দ (একত্রে) কোনো দিনই দেখিনি। যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তাহলে কম হাসতে আর বেশি কাঁদতো।” সুতরাং সাহাবীদের জন্য সেদিনকার মতো কঠিনতম দিন আর ছিল না। তাঁরা তাঁদের মাথা আবৃত করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

মাইয় রা. এর ওপর যিনার শাস্তি বাস্তবায়ন করার পরেও নবীজি ﷺ সাহাবীদের উদ্দেশে বক্তব্য রেখেছিলেন। যুহরের সালাতের পর তিনি আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, “সাবধান! আমরা যখন আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে গমন করি, তখন কেউ কেউ পেছনে থেকে যায় এবং পাঁঠার ন্যায় আওয়াজ করে (অর্থাৎ পাঁঠা যেমন সঙ্গমের সময় উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করে তদ্রূপ) আর তাদের সে অল্প দুধ দেয়। (অর্থাৎ সঙ্গম করে, দুধের অর্থ বীর্য)। আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ আমাকে এই শ্রেণির কোনো লোকের ওপর ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে আমি তাকে অবশ্যই শাস্তি দেব।”

নবীজি মাইয়ের মাগফিরাতের জন্য কোনো দুআও করলেন না; আবার তার ব্যাপারে মন্দও বললেন না। (কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে পরবর্তী সময়ে তিনি সাহাবাদের মাইয়ের জন্য দুআ করতে বলেছিলেন।) ^{৭৪}

যখন কোনো জরুরি ঘটনা ঘটত যার ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন,

[৭৩] আরবি শব্দ ‘আওলা’ সতর্কতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, “সাবধান, তোমরা অচিরেই তা দেখতে পাবে যা তোমরা অপছন্দ করো।”

[৭৪] তুলনীয়ঃ সহীহ মুসলিম, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, অপরাধের শাস্তি, হাদিস নং- ৪২৭৫

তখনই নবীজি ﷺ এ ধরনের বক্তব্য প্রদান করতেন। তিনি জরুরি ইস্যুকে পরবর্তী জুমআর খুতবায় আলোচনা করার জন্য ফেলে রাখতেন না।

তারপর নবীজি ﷺ সাধারণত ঘরে ফিরে যুহরের দুই রাকাত সুন্নাত সালাত আদায় করতেন। ফরয সালাতের পর এ দুই রাকাত সুন্নাত সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

নবীজি ﷺ হয়তো কিছুক্ষণ পর সাহাবীদের সাহচর্য দেয়ার জন্য আবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন। আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের সাথে থাকতেন। একবার আব্দ কায়েস গোত্র থেকে প্রতিনিধিদল আসলে তিনি তাদের সাথে যুহর থেকে আসরের মধ্যবর্তী সময়টুকু কাটান।

তিনি এ সময়টাতে সামাজিক সমস্যাবলি সমাধানেও তৎপর হতেন। একবার নবীজি ﷺ খবর পেলেন কুবার অধিবাসীদের সাথে আমর ইবনু আওফের গোত্রের কলহ হয়েছে। তাদের মধ্যে ঝামেলা এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল যে তারা একে অপরের দিকে পাথর পর্যন্ত ছুড়ে মারছিল। তিনি কিছু সাহাবীদের বলেন, “চলো আমরা সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দিই।” তিনি বিলাল রা. কে বললেন, “যদি আসরের সালাতের সময় চলে আসে আর আমি ফিরে না আসি, তবে নামাজে ইমামতি করানোর জন্যে আবু বকরকে বলবো।”

আসরের সময় হয়ে গেল। নবীজি ﷺ ফিরে আসলেন না। বিলাল রা. তখন আবু বকরকে ইমামতির অনুরোধ জানালেন। বিলাল রা. ইকামত দিলেন আর আবু বকর রা. এগিয়ে এসে সালাতে ইমামতি শুরু করলেন। মুসল্লিগণও সালাত শুরু করে দিলেন। সেই সময়ে নবীজি ﷺ ফিরে আসলেন এবং প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। মুসল্লিগণ হাত দিয়ে তালি বাজাচ্ছিলেন কিন্তু আবু বকর রা. ঘাড় ফেরালেন না। যখন হাত তালির পরিমাণ বেড়ে গেল তখন তিনি তার চেহারা হালকা কাত করে নবীজিকে দেখতে পেলেন। আবু বকর পেছনে চলে আসতে চাইলেন, যাতে করে নবীজি ﷺ সালাতে ইমামতি করান। কিন্তু নবীজি ﷺ হাতের ইশারায় আবু বকরকে স্বস্থানে থাকতে বললেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বকর রা. কে যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন, সেভাবে তিনি আকাশের দিকে দু-হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর পিছিয়ে এসে প্রথম কাতারে দাঁড়ালেন আর নবীজি ﷺ ইমামের স্থানে গিয়ে সালাতে ইমামতি করলেন। সালাত শেষ হওয়ার পর নবীজি ﷺ লোকদের দিকে ফিরে বললেন, “সালাতে কিছু ঘটলে তোমরা হাত তালি দিলে কেন? হাত তালি দেয়া তো মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। সালাতে কিছু ঘটলে

তোমরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। কেউ যখন তা শুনবে সে তখন চেহারা ফেরাবে।”

তারপর নবীজি ﷺ আবু বকর রা. কে জিজ্ঞেস করলেন যে, স্পষ্টভাবে তাকে সালাত চালিয়ে যাওয়ার সংকেত দেওয়ার পরও তিনি কেন ইমাম হিসেবে সালাত চালু রাখলেন না? আবু বকর রা. জবাবে বললেন, “নবী ﷺ-এর উপস্থিতিতে আমি সালাতে ইমামতি করব এটি সমীচীন নয়।”

আরেকবার নবীজি ﷺ ‘আলবাক্বি’র উত্তরদিকে অবস্থিত আলআসওয়াফ নামক এলাকায় সাদ ইবনু আর-রাবির কন্যাদের সাথে দেখা করতে গেলেন। তারা ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মুসলিম মহিলা, যারা নিজেদের পিতা থেকে উত্তরাধিকারের সম্পদ ভোগ করেন। নবীজি ﷺ তাদের পিতার সম্পত্তি ভাগ করে তাদের দিতে সেখানে গিয়েছিলেন। নবীজি ﷺ দুপুরবেলা রওনা দিয়েছিলেন, সেখানে পৌঁছানোর পর তারা নবীজির নিকট কিছু রান্না করা গোশত আর রুটি পেশ করল। নবীজি ﷺ তা সাথের সঙ্গীদের নিয়ে খেলেন। তারপর উযু করে যুহরের সালাতে ইমামতি করালেন। সালাত শেষে নবীজি ﷺ সাদের কন্যাদের মাঝে জায়গা-জমি ও সম্পত্তি বণ্টন করে দেয়ার কাজে বসলেন, আসরের ওয়াক্ত আসার আগেই মিরাহের সম্পত্তি বণ্টনের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল। একই খাদ্য আবার নবীজি ﷺ-এর সামনে পেশ করা হলো। তিনিও সাথের সাহাবীদের নিয়ে সে খাদ্য গ্রহণ করলেন। তারপর আসরের সালাতের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবীজি ﷺ কিংবা সাহাবীদের কারওই আবার নতুন করে উযু করার প্রয়োজন হয়নি।

আসরের ওয়াক্তে

আসরের আযান হওয়ার পর নবীজি ﷺ মসজিদে মুসল্লীদের জড়ো হওয়া অঙ্গি অপেক্ষা করতেন। তিনি সবাইকে ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত আদায়ের জন্য উৎসাহ দিতেন। নবীজি ﷺ বলতেন, “সেই ব্যক্তির ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, যে আসরের পূর্বে চার রাকাত সালাত আদায় করে।” মসজিদ প্রাঙ্গণে সাহাবীরা একত্র হলে তিনি সালাতে ইমামতি করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে আসতেন। ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে সূর্য ঢলে পড়ার অনেক আগেই তিনি আসরের সালাত আদায় করতেন। আনাস রা. বর্ণনা করেন, “কখনোই অন্য কেউ আসর আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর থেকে অধিক তৎপর ছিলেন না।” যোহরের সালাতে তিনি যতটুকু কুরআন তিলাওয়াত করতেন আসরের ওয়াক্তে পড়তেন তার প্রায় অর্ধেক।

সালাত শেষ হওয়ার পর তিনি সাহাবীদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং তাদের উদ্দেশে কোনো কিছু বলার থাকলে তা বলতেন। একবার আসরের পরে তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, “তোমাদের কিছু বলা উচিত কি না সে বিষয়ে আমি দ্বিধাশ্রিত।”

সাহাবীরা বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি কল্যাণকর কিছু হয় তবে দয়া করে আপনি আমাদের সেটা বলুন। আর যদি কল্যাণকর না হয় তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসূলই ﷺ এ বিষয়ে সর্বাধিক অবহিত।”

নবীজি ﷺ তখন বললেন, “যদি কোনো মুসলিম উত্তম এবং পূর্ণাঙ্গরূপে তার ওপর ফরযকৃত পবিত্রতা অর্জন করে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত আদায় করে, তাহলে এটি সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে তার দ্বারা সংঘটিত পাপগুলোর ক্ষমা নিশ্চিত করে দেয়।” ৭৫ একদিন নবীজি ﷺ আসরের সালাত আদায় করে দাঁড়ালেন এবং সাহাবীদের সম্বোধন করে বললেন, “তোমাদের মধ্যে যে উত্তমরূপে ওয়াক্ত করার পর বলে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থ : ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।’

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। সেগুলোর যেকোনোটি দিয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। কোনো মুসলিম যদি উত্তমরূপে ওয়ু করে এবং তারপর দাঁড়িয়ে পূর্ণ মনোযোগের সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করে তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।” ৭৬

যোহরের তুলনায় আসরের পর নবীজি ﷺ অনেক কম কথা বলতেন। তিনি বুঝতে পারতেন যে, মানুষ ক্লান্ত। তা ছাড়া দিনের বাকি কাজটুকু শেষ করার জন্য এবং রাতের খাবার প্রস্তুতের জন্য তাদের অবকাশ দেয়া প্রয়োজন। আসরের সালাত শেষ করে তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে যেতেন। তিনি একে একে তাদের সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। প্রত্যেকের সাথে সহবাস ব্যতীতই তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতেন, চুমু খেতেন অথবা খুনসুটি করতেন। যেদিন যার সাথে থাকার পালা থাকত তার ঘরে তিনি সবার শেষে যেতেন এবং ওই রাত তিনি সেই স্ত্রীর সাথেই কাটাতেন।

আর মাঝে মাঝে বাকি সব স্ত্রীরা যার পালা থাকত ওইদিন তার ঘরে জমা হতেন। খুব সম্ভবত তারা এটা শীতকালে করতেন, যখন দিন ছোট হতো এবং আলাদা করে প্রত্যেক স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসর ও মাগরিবের মাঝে যথেষ্ট সময় নবীজি ﷺ-এর হাতে থাকত না। তাই তখন তিনি সবার সাথে একবারেই সাক্ষাৎ করতেন।

কোনো একবার তারা আয়িশা রা. এর ঘরে জমায়েত হলেন যেখানে যাইনাব বিনতে জাহাশ রা.ও উপস্থিত ছিলেন। রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশের পর যখন যাইনাব রা. এর হাত ধরলেন তখন আয়িশা রা. বলে উঠলেন, “এটা যাইনাব।” সাথে সাথে নবীজি ﷺ তার হাত ছেড়ে দিলেন। তাদের দুই জনই তর্ক শুরু করলেন, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গিয়েছিল। একটু পরেই মসজিদে ছিল সালাতের জামাত। তাই আবু বকর রা. সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি সজোরে বললেন, “সালাতের জন্য আসুন ইয়া রাসূলাল্লাহ এবং এদের মুখে ধুলো ছুড়ে দিন।”

রাসূল ﷺ সালাতের জন্য বের হয়ে আসলেন। আয়িশা রা. বললেন, “সালাত আদায়

করে আবু বকর রা. এখন এদিকেই আসবেন এবং আমার ওপর হাত তুলবেন।” ৭৭
 নবীজি ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন তখন আবু বকর রা. পুনরায় আয়িশা রা. এর কাছে গেলেন এবং রাগত স্বরে তাকে বললেন, “তুমি কীভাবে এমনটা করতে পার?”
 কখনো কখনো আসরের সালাত শেষ করে নবীজি ﷺ ঘরে যেতেন এবং দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করতেন, যদিও আসর শেষ করার পর মাগরিব পর্যন্ত কোনো নফল সালাত আদায়কে তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন। এ রকমটা ঘটেছিল যখন আব্দুল কায়েস গোত্রের একটা প্রতিনিধিদল মদীনায় রাসূল ﷺ-কে তাদের সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণের কথা জানাতে এসেছিল। তিনি যোহর সালাতের পর তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সাথে ব্যস্ত থাকায় যোহরের পরে নিয়মিত আদায় করা দুই রাকাত সালাত তার বাদ পড়ে গিয়েছিল। এই জন্যই তিনি আসরের পর যোহরের বাকি থাকা দুই রাকাত সুন্নাতের কাযা আদায় করেছিলেন। এরপর থেকে এই সালাত তিনি নিয়মিত আদায় করতেন। কেননা, একবার কোনো সুন্নাত আদায় করে ফেললে পরবর্তী সময়ে সেটা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া তার অভ্যাস ছিল। আয়িশা রা. বর্ণনা করেন, “সেই সত্তর শপথ, যিনি তার প্রাণ জড়ো করেছেন, রাসূল ﷺ স্বীয় রবের সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই দুই রাকাত কখনোই পরিত্যাগ করেননি” ৭৮, অর্থাৎ আসরের পরের রাকাতগুলো।” ৭৯ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসরের পরের সময়টুকু তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে অতিবাহিত করতেন।

নবীজি ﷺ যখন স্ত্রীদের সাথে সময় কাটাতেন তখন অত্যন্ত আনন্দঘন পারিবারিক আবহ বিরাজ করত। অবসরের এই সময়টুকুতেও তারা ইলম অন্বেষণে করতেন, আলোচনা হতো বিবিধ সমস্যা কিংবা প্রশ্ন নিয়ে। রাসূল ﷺ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এ ধরনের প্রশ্নগুলো শুনতেন এবং সেসব প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ জবাবও দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, আয়িশা রা. এর করা একটি প্রশ্নের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে এবং মানুষকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালাতে

[৭৭] যাইনাব রাসূলের একজন স্ত্রী ছিলেন। যেহেতু জমায়েত আয়িশা রা.-এর ঘরে ছিলো সুতরাং সেদিন ছিলো তার পালা। তাই নবীজি ﷺ যাইনাব রা. এর হাত ধরায় তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে এমনটা করেছিলেন। তদুপরি আয়িশা রা. ভীত ছিলেন এটা ভেবে যে, তার পিতা তার ওপর রাগ করবেন।

[৭৮] আসরের পরে নফল পড়া জায়েজ নেই। কারণ, এটি মাকরুহ সময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উল্লেখিত হাদীসে আসরের পর নামায পড়ার যে বিষয়টি জানা যায়, এটি শুধু তাঁর জন্যই খাস। - ফাতহুল বারী (২/৬৪), ফাতওয়ায়ে লায়না দায়িমা (৬/১৭৩)

[৭৯] সহীহ বুখারি : ৫৯৩

গিয়ে নবীজির সর্বাধিক কষ্টের অভিজ্ঞতা কোনটা ছিল? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি কখনো উহুদের দিনের চেয়েও বেশি কষ্টকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন?”

নবীজি ﷺ জবাবে বললেন, “আমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এর থেকেও বেশি দুর্ব্যবহার পেয়েছি। যার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতাটি হয়েছিলো আকাবাহর দিনে আব্দ ইয়ালিল আব্দ কুলালের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর পর। সে আমার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমি খুব হতাশ হয়ে ফিরে আসলাম এবং বুঝতেও পারছিলাম না আমি ঠিক কোন দিকে যাচ্ছি। কারণ, আস-সালিবে পৌঁছার পরই যেন আমার বোধশক্তি ফিরে পেলাম।^{৮০} ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমার মাথার ওপর একখণ্ড মেঘ। আমি সেখানে জিবরাঈল আ. কে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, “আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাকে যা বলেছে এবং যেভাবে তিরস্কার করেছে তা আপনার রব শুনেছেন। তিনি পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন যেন তাদের ব্যাপারে আপনি তাকে আদেশ করেন। পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতা আমাকে সম্বোধন করে সালাম জানালেন এবং বললেন, “মুহাম্মাদ, আপনার লোকেরা আপনাকে যা বলেছে তা আপনার রব শুনেছেন। আমি পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতা। আপনার রব আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যাতে আমি আপনার আদেশ পালন করতে পারি। আপনার যা ইচ্ছা আদেশ করুন। আপনি চাইলে তাদের এই দুই পাহাড়ের মধ্যে পিষে ফেলব।”^{৮১}

আমি বললাম, “না। আমি আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ তাদের বংশধরদের মধ্য হতে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা কারও সাথে শরীক না করেই এক আল্লাহর ইবাদাত করবে।

রাসূল ﷺ এর সাথে আয়িশা রা. এর এ ধরনের আবেগপূর্ণ আলোচনা প্রমাণ করে যে, তিনি রাসূলের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাগুলো জেনে নিতে কতট আগ্রহী ছিলেন। নবীজি ﷺ-এর সবচেয়ে কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতার কথা তিনি অবহিত হতে চেয়েছেন, যাতে করে তাঁর সেই পীড়াদায়ক অনুভূতিটুকু নিজেও কিছুটা অনুভব করতে পারেন।

[৮০] এটা তাদ্বীফের নিকটে অবস্থিত কারন আল-মানাযিলের অপর নাম যা হজ্জযাত্রীদের মক্কায় প্রবেশের পূর্বে ইহরাম বাধার স্থান।

[৮১] মক্কার সম্মুখে কুবাইস এবং কুয়াইকিয়ান নামে নামে দুইটি পর্বত আছে। পাথরের কাঠিন্যের কারণেই এই পাহাড়দুটি বেশ পরিচিত।

এই ঘটনায় রাসূল ﷺ-এর ব্যক্ত মনোভাব তাঁর রবের দ্বারা জমকালোভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। তাঁর মহিমামণ্ডিত জীবনাবসানের পূর্বেই সেই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটানো হয়েছিল। মূর্তিপূজারি পিতা-মাতার সন্তান-সন্ততিদের ইসলাম গ্রহণ, এক আল্লাহর ইবাদাত, তাঁর সাথে শরীক স্থাপন না করা, এমনকি আল্লাহর রাসূল এবং তার প্রচারিত বাণীর প্রতিরক্ষায় তাদের স্বীয় জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকাও তিনি স্বচক্ষে দেখে গেছেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে নবীজি ﷺ আয়িশা রা. কে বললেন, “বিচার দিবসে যার হিসাব চাওয়া হবে তার শাস্তি অবধারিত।”

আয়িশা রা. ইলম অন্বেষণে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বিশেষ করে যখন কোনো বক্তব্য তার কাছে পরস্পরবিরোধী মনে হতো তিনি তখন সেই বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। তাই রাসূল ﷺ এর এই মন্তব্য শোনার সাথে সাথেই তিনি এই বলে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করলেন যে, “কিন্তু আল্লাহ মুমিনদের সম্পর্কে বলেছেন,

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

‘অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবেই নেয়া হবে।’” ৮২

নবীজি ﷺ তখন বললেন, “এই আয়াত তো জবাবদিহিতার কথা বলছে না; বরং এটা হিসাব হস্তান্তরের কথা বলছে। যাকে তার কাজ সম্বন্ধে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে, তাকেই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।”

একদিন কথাপ্রসঙ্গে নবীজি ﷺ হাফসা রা. কে বললেন, “যারা বদরের যুদ্ধ এবং হৃদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিল তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না বলেই আমি আশা পোষণ করি।”

হাফসা রা.ও তখন বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, নিশ্চয়ই তাঁরা জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না।”

নবীজি ﷺ তার উক্ত কথার সমালোচনা করে বললেন, “আল্লাহ কি কুরআনে বলেননি :

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا

‘তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফায়সালা’।” ৮০

তিনি আরও বললেন, “তুমি কি শোনোনি এর পরের আয়াতে আল্লাহ কী বলেছেন :

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا

‘অতঃপর মুত্তাকীদের আমি রক্ষা করব আর যালিমদের তার মধ্যে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব’।” ৮৪

উক্ত বর্ণনাগুলোই প্রমাণ করে যে, নবীজি ﷺ স্ত্রীদের শুধু প্রশ্ন এবং বিতর্ক করার সুযোগই দিতেন না; বরং উৎসাহও দিতেন। তিনি প্রমাণ উপস্থাপন এবং মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার লক্ষ্যে আলোচনা এবং কথোপকথনকেই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

সাহাবীরা মাঝে মাঝে আসরের পর নবীজিকে ﷺ তাদের ঘরে দাওয়াত দিতেন। কারণ, কোনো একটা বিশেষ কাজ করার সময় নবীজি ﷺ-এর উপস্থিতিতে তারা পছন্দ করতেন। তিনিও তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতেন না। একবার আসরের পর সালামাহ গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা একটু পরেই একটা উট জবাই করব। আর আমরা খুব করে চাই, যেন আপনি আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন।” তাদের জন্য পশু জবাই করাটাই যেন ছিল একটা উৎসব। কারণ, তাদের খাদ্যতালিকায় মাংসের দেখা কদাচিৎ মিলত। তাই রাসূল ﷺ এই দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সাথে রওনা দিলেন। পৌঁছার পর দেখা গেল উটটি তখনো জবাই করা বাকি। নবীজি ﷺ এর আগমনের পর সেটা জবাই করা হলো এবং গোশতগুলো ভাগ করে কিছু অংশ তারা সূর্যাস্তের পূর্বে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করলেন।

এই মুহূর্তটির ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনার দক্ষিণ দিকে শহরের প্রায় শেষপ্রান্তে মসজিদে নববী থেকে সবচেয়ে বেশি দূরত্বে অবস্থিত সালামাহ গোত্রের বসতিতে গিয়েছিলেন কেবল একটা উট জবাইয়ের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে। আমার মনে হয় তিনি হেঁটে হেঁটে এতদূর গিয়েছিলেন শুধু মানুষগুলোকে

[৮০] সূরা মারিয়াম ১৯:৭১

[৮৪] সূরা মারিয়াম ১৯:৭২

খুশি করার জন্য এবং তাদের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দিতে। সুতরাং মুহূর্তটি তাদের জন্য কেবল পশু জবাইয়ের উপলক্ষ্য না থেকে রাসূলের সাথে চড়ুইভাতি করার মতো আনন্দময় উৎসবে রূপান্তরিত হলো। নিশ্চয়ই সালামাহ গোত্রের মানুষের মনে এই সুখময় স্মৃতি অনেক দিন পর্যন্ত জাগ্রত ছিল!

কতই-না অমায়িক, বদান্য আর সহৃদয়বান মানুষ ছিলেন আমাদের নবীজি ﷺ! মানুষকে পুলকিত করার এবং তাদের আনন্দানুভূতি বাড়িয়ে দেয়ার প্রত্যেকটা সুযোগই তিনি লুফে নিতেন। তার এই অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই তিনি সাহাবীদের হৃদয়রাজ্য দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সূর্যাস্তের পর

মাগরিবের আযানের সামান্য কিছু সময় পরই নবীজি ﷺ ঘর থেকে বের হতেন। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তিনি সাহাবীদের সুনাত দুই রাকাত সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখতেন, যা করার জন্য নবীজি ﷺ তাদের উৎসাহিত করে বলেছিলেন, “মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত সালাত আদায় করো।” কিন্তু তিনি তিনবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করে চতুর্থবার বললেন, “যদি তোমরা চাও।” এই দুই রাকাত খুবই সংক্ষেপে আদায় করতে হতো; কারণ, মাগরিবের আযান এবং ইকামাতের মধ্যে খুবই অল্প সময়ের ব্যবধান থাকত।^{৮৫}

[৮৫] মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায পড়ার বিধান নিয়ে ইমামদের মধ্যে দলীলের আলোকে মতনৈক্য রয়েছে। ফিকহে হানাফীতে এটি সুন্নত বা মুস্তাহাব নয়। তবে তা জায়েয আছে। খোলাফায়ে রাশেদীনসহ সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই এ সময় কোনো নামায পড়তেন না। যেমন সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.কে মাগরিবের ফরযের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কাউকে উক্ত নামায পড়তে দেখিনি। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১২৭৮) মুসান্নাফে আবদুর রায়যাকে সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাজির সাহাবীগণ মাগরিবের আগে দুই রাকাত নামায পড়তেন না। আর আনসারী সাহাবীগণ তা পড়তেন। (মুসান্নাফে আবদুর রায়যাক, হাদীস : ৩৯৮৪) ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. বলেন, আবু বকর, উমর ও উসমান রা. মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়তেন না। (মুসান্নাফে আবদুর রায়যাক, হাদীস : ৩৯৮৫)

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম নাখায়ী রাহ.-কে মাগরিবের পূর্বে নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা পড়তে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর ও উমর রা. তা পড়েননি। (কিতাবুল আছার ১/১৬৩)

সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনসহ সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই যেহেতু এ সময় কোনো নফল নামায পড়তেন না এবং এ সময়ের নফল নামাযের বিশেষ কোনো ফযীলতও হাদীসে বর্ণিত নেই; অন্যদিকে মাগরিবের নামায আযানের পর বিলম্ব না করে দ্রুত আদায় করার কথা অন্যান্য হাদীসে এসেছে তাই এসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ উক্ত দু' রাকাত নফল নামাযকে সুন্নত বা মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল হিসেবে গণ্য করেননি।

আর শাফেয়ী মাযহাবে এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। একটি মত অনুযায়ী এ সময় দু' রাকাত নফল পড়া মুস্তাহাব। আর অপর মত অনুযায়ী তা জায়েয। যারা মুস্তাহাব বলেন তারা এ সংক্রান্ত একটি হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। হাদীসটি হল-

بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، ثم قال في الثالثة : لمن شاء

(অর্থ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নামায রয়েছে। প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নামায রয়েছে। অতপর তৃতীয়বার বললেন, ‘যে ব্যক্তি চায়।’ (সহীহ বুখারী : ৬২৭)

নবীজি ﷺ মসজিদে প্রবেশের পর ইকামাত দেয়া হতো এবং সাথে সাথেই নামায শুরু হয়ে যেত। তিনি শুরুর ওয়াক্তেই মাগরিবের সালাতে দাঁড়াতেন এবং অন্ধকার নামার পূর্বেই শেষ করে ফেলতেন। এমনকি লোকেরা যখন সালাত শেষ করে বাড়ি ফিরত তখনো দিনের আলো এত পরিমাণ থাকত যে কেউ একটি তির ছুড়লে সেটা কোথায় নামছে দেখা যেত।

অধিকাংশ সময়েই মাগরিবের সালাত নবীজি ﷺ খুব কম সময় নিয়ে শেষ করতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। তবে কদাচিৎ তিনি লম্বা আয়াতও তিলাওয়াত করতেন। একবার তিনি মাগরিবের সালাতে কুরআনের ৭ম সূরা ‘আল-আরাফ’^{৮৬} তিলাওয়াত করলেন এবং অন্য একদিন ৫২তম সূরা ‘আত-তুর’ তিলাওয়াত করেছিলেন। ওফাতের পূর্বে তিনি সর্বশেষ মাগরিবের সালাতের ইমামতি করেন এবং ওইদিন নবীজি ﷺ ৭৭ তম সূরা ‘আল-মুরসালাত’ তিলাওয়াত করেছিলেন।

অন্য সালাতের শেষে যেরকম নবীজি ﷺ সাহাবীদের সাথে কথা বলতেন মাগরিবের পর সে রকমটা করতেন না। কারণ, তখন মানুষের রাতের খাবার গ্রহণ করা এবং বিশ্রাম নেয়ার সময়। ফরজ সালাত শেষ করে ঘরে ফিরে তিনি দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায় করতেন। তারপর তিনি রাতের খাবার গ্রহণ করতেন; কারণ, এটাই ছিল তাদের নৈশভোজের নির্ধারিত সময়। অবশ্য সিয়াম পালন করলে তারা মাগরিবের নামায আদায়ের পূর্বেই খাবার সেরে নিতেন। উপরন্তু নবীজি ﷺ এ বিষয়ে নির্দেশও দিয়েছেন, “যদি তোমাদের সামনে রাতের খাবার উপস্থিত করা হয় তবে মাগরিবের সালাতের পূর্বেই খাবার গ্রহণ করে নাও। সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত নৈশভোজকে বিলম্বিত কোরো না।”

নবীজি ﷺ সাহাবীদের কোনো একজন দরিদ্র লোককে সাথে নিয়ে রাতের খাবার গ্রহণের

তবে ভিন্নমতের আলেমগণ বলেন যে, এটি শুধু জায়েয হওয়ার দলিল, মুস্তাহাব হওয়ার নয়।

যাইহোক, এই সালাতকে যারা মাকরুহ বা অনুত্তম বলেছেন, তারা এর কারণ হিসেবে এটাও বলেছেন যে, যাতে করে মাগরিবের সালাত শুরু করতে বিলম্ব না হয়। কেননা মাগরিবের সালাত দ্রুত শুরু করা মুস্তাহাব।

কোথাও যদি আযানের পর মাগরিবের জামাত শুরু করতে দেরি হয় আর এই ফাঁকে কেউ হাদীসের ওপর আমল করার আগ্রহে দুই রাকাত সালাতের আদায় শুরু করে তবে তাকে বাধা দেওয়া অনুচিত। কারণ এটি অনুত্তম হওয়ার যে কারণ, সেটি এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। - সম্পাদক

[৮৬] এটি কুরআনের ৭ম অধ্যায় যা ২৬ পৃষ্ঠায় সম্বন্ধিত কুরআনের চতুর্থ দীর্ঘতম সূরা, যেখানে ৫২তম সূরাটি মাত্র আড়াই পৃষ্ঠার, ৭৭তম সূরাটি দেড় পৃষ্ঠার এবং নবীজি ﷺ সূরা আরাফের মতো দীর্ঘ সূরাটি মাগরিবের প্রথম দুই রাকাতে শেষ করেছিলেন।

জন্য উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন, “যার কাছে দুই জনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার আছে তার তৃতীয় এক জনকে খাওয়ানো উচিত এবং যার কাছে চার জনের জন্য পর্যাপ্ত খাবার আছে তার উচিত পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ একজন লোককে সাথে নিয়ে খাওয়া।” যথেষ্ট খাবার থাকলে নবীজি ﷺ নিজেই অন্তত দশ জন মানুষের সাথে রাতের খাবার ভাগ করে নিতেন। আবার কখনো কখনো তাঁর ঘরে সামান্য ক’টা খেজুর এবং পানি ছাড়া খাওয়ার মতো আর কিছুই থাকত না। এমনকি দিনের পর দিন নবীজি ﷺ-এর চুলায় আগুনও জ্বলত না।

একদিন এক ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত লোক এসে তাঁর কাছে কিছু খাবার চাইল। অনাহার আর চরম অবসাদের চিহ্ন তাঁর চেহারায়ে ছিল সুস্পষ্ট। সে তাঁর দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।”

নবীজি ﷺ সাথেই সাথেই একজন সাহাবীকে তাঁর কোনো একজন স্ত্রীর কাছে খাবারের সন্ধানে পাঠালেন। তাঁর স্ত্রী জবাব পাঠালেন, “সেই স্বত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমার ঘরে পানি ছাড়া খাবার মতো আর কিছুই নেই।” তিনি আরেকজন স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালেন এবং তিনিও একই জবাব দিলেন। এমনকি তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে খাবারের খোঁজে লোক পাঠালেন এবং তারা সবাই একই কথা বললেন, “তাদের কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই।”

রাসূল ﷺ তখন সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন, “যে লোকটিকে আজ রাতের মেহমান হিসেবে গ্রহণ করবে আল্লাহ যেন তার ওপর রহম করেন।”

আবু তালহা আল-আনসারী রা. তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাবটি লুফে নিলেন এবং বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তাঁকে সাথে নেব।” আবু তালহা রা. তখন লোকটিকে তার মেহমান হিসেবে বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

নবীজি ﷺ-এর খাবার সব সময়ই মেঝেতে একটা চাটাই বিছিয়ে পরিবেশন করা হতো। তিনি কখনোই টেবিলে বসে খাবার গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে খাবার নিয়ে আসা হলে তিনি ‘বিসমিল্লাহ’ বলে খাওয়া শুরু করতেন এবং পাত্রের যে অংশ তাঁর নিকটে থাকত সেখান থেকে খাবার তুলে নিতেন। তিনি তিন আঙুল দিয়ে খাবার মুখে পুরতেন। কেউ তাঁর সাথে খেতে বসলে তাদেরও তিনি পাত্রের মাঝখান^{৭৭} থেকে না খেয়ে বরং কাছের

[৮৭] পাত্রের উপরের অংশে থাকা খাবার

অংশ থেকে খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলতেন, “বরকত রয়েছে পাত্রের মধ্যখানে।”

নবীজি ﷺ খুব একটা ভোজনরসিক ছিলেন না। ঘরে যা থাকত তা-ই তিনি খেয়ে নিতেন। তিনি তাঁর স্ত্রীদের জিজ্ঞেস করতেন, “তোমাদের কাছে খাবার কিছু কি আছে?”

তারা হয়তো কখনো জবাব দিতেন, “আমাদের কাছে শুধু কিছু সিরকা আছে।”

তিনি তখন বলতেন, “রুটির সাথে সিরকা মিলিয়ে খাওয়া তো স্বাস্থ্যকর।”

তিনি কখনোই কোনো খাবারের দোষ ধরতেন না। ভালো লাগলে খেতেন; আর ভালো না লাগলে তিনি খাওয়া থেকে উঠে যেতেন।

যখন তিনি সাহাবীদের সাথে খেতে বসতেন সেই মুহূর্তটাও কিছু খোশগল্প, অথবা সুন্দর কোনো আদব শিক্ষাদান, কিংবা জ্ঞানের প্রচার থেকে কখনোই বিরত থাকতেন না! এ বিষয়ে একটা উদাহরণ উল্লেখ করা যায়।

নবীজি ﷺ-এর সৎ ছেলে উমর ইবনে আবু সালামাহ তাঁর গৃহেই প্রতিপালিত হন। তাঁর মা ছিলেন নবীজি ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামাহ রা.। উমর রাসূল ﷺ এর সাথে একত্রে বসে খাওয়া-দাওয়া করতেন। একদিন খেতে বসে তিনি লক্ষ্য করলেন উমর প্লেটের সব জায়গাতেই তার হাত ঘুরাচ্ছেন। একেকবার একেক ধার থেকে গোশত উঠাচ্ছেন। নবীজি ﷺ তাকে বললেন, “বালক, আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু করো। ডান হাতে খাও এবং তোমার কাছের অংশ থেকে খাবার উঠাও।”

উমর পরবর্তীতে বলেছিলেন, “তখন থেকে আমি এভাবেই খেতাম।”

একদিন নবীজি ﷺ-এর সামনে এক বাটি সারিদ এবং গোশত পরিবেশন করা হলো। তিনি ঘাড়ের অংশটা নিলেন, যা তিনি সব থেকে বেশি পছন্দ করতেন। গোশতের সেই অংশটা থেকে এক লোকমা^৮ নিয়ে তিনি বললেন, “বিচার দিবসে আমি মানবজাতির নেতা হব।”

তিনি অতঃপর আরও এক লোকমা খেলেন এবং পূর্বে বলা কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। কেউই তাঁকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তারপর তিনি বললেন, “তোমরা কি জানতে চাও না, কীভাবে? (আমি মানবজাতির নেতা হব)”

তারা তখন জিজ্ঞেস করলেন, “সেটা কীভাবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ?”

তিনি জবাব দিলেন, “বিচার দিবসে আল্লাহ পূর্বের এবং পরের সকল মানুষকে একই

[৮৮] আরবীতে এই কথার মানে হলো ‘কেবল সামনের দাঁত দিয়ে এক লোকমা খাবার গ্রহণ করা।

সমতলভূমিতে একত্র করবেন, যাতে করে তারা আহ্বানকারীর আহ্বান শুনতে পায় এবং স্বচক্ষে দেখতেও পারে। সূর্য তাদের মাথার খুব কাছে চলে আসবে এবং তারা গভীরভাবে এর প্রখর উত্তাপ অনুভব করবে। এটা যতই মাথার কাছে আসতে থাকবে তাদের দুর্ভোগ বাড়তে থাকবে। মানুষ ভয়ানক কষ্টের সম্মুখীন হবে। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা তা সহ্য করা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হবে। তাদের কয়েকজন বলবে, “চলো, আমরা আদম (আ.)-এর কাছে যাই...।” রাসূল ﷺ তাদের সেই লম্বা হাদীসটি বলেন, যাতে তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফায়াত প্রদানের সুযোগ দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

খাবার গ্রহণের পর তিনি তাঁর আঙুলগুলো চাটতেন। ৮৯ তিনি সাহাবীদেরও প্লেট চেটে খাওয়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, “তোমরা জানো না, খাবারের কোনো অংশে বরকত রয়েছে।” যখন খাবার গ্রহণের পর সরিয়ে নেয়া হতো তখন তিনি এক হৃদয়স্পর্শী দুআর মাধ্যমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন:

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! এমন প্রশংসা, যা অটল ও পবিত্র এবং যাতে রয়েছে বরকত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের আহ্বারের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য এবং পান করার জন্য যথেষ্ট পানীয় প্রদান করেছেন। আমাদের রবের প্রতি কখনোই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না। আর না আমরা কখনো তাঁকে অস্বীকার করতে পারি কিংবা তাঁর নিয়ামত থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারি। হে আমাদের রব, তুমিই আমাদের খাবার এবং পানীয় জোগান দিয়েছ, দিয়েছ সহায়-সম্পত্তি, জীবনোপকরণ এবং দেখিয়েছ সঠিক পথ। তোমার জন্যই সকল প্রশংসা সেই সবকিছুর জন্য, যা তুমি আমাদের দিয়েছ।”

নবীজি ﷺ খাবার গ্রহণ এবং দুধ পান করার পর কুলি করতেন। তিনি বলেন, দুধের মধ্যে রয়েছে চর্বি।

নবীজি ﷺ খাবার গ্রহণকালে সকাল থেকেই একটা পানীয় প্রস্তুত রাখা পছন্দ করতেন এবং দিনের শুরুর দিকে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে ফেললে রাতের আগেই তিনি সেই পানীয় প্রস্তুত থাকা পছন্দ করতেন।

স্ত্রীদের সাথে খাবার গ্রহণকালে তিনি অত্যন্ত সরস কথোপকথন চালাতেন। এমনকি

[৮৯] রাসূল ﷺ এভাবেই খাবার অপচয় না করার গুরুত্ব শিক্ষা দিতেন। কোনোকিছুই ফেলে দেয়া যাবে না। এমনকি আঙ্গুলের সাথে লেগে থাকা সামান্য খাবারটুকুও শরীরের জন্য উপকারী এবং তা গ্রহণ করা উচিত। খাবার হচ্ছে আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। তাই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দাবীই হচ্ছে আমরা যেন খাবারের কোন অংশই অপচয় না করি।

তিনি এই কাজকে উৎসাহিত করতেন। নবীজি ﷺ বলেন, “স্ত্রীর মুখে এক লোকমা খাবার তুলে দেয়াও সাদাকা।”

আয়িশা রা. তার সাথে রাসূল ﷺ এর খাবার গ্রহণের একটা সুন্দর ঘটনা ব্যক্ত করেন, “আমার মাসিক চলাকালে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাথে খাবার গ্রহণের জন্য ডাকতেন। তিনি গোসতযুক্ত একটা হাড় নিয়ে আমাকে সেটা থেকে খাওয়ার ওয়াদা করাতেন। আমি কিছুটা খেয়ে বাকি অংশ রেখে দিতাম। তারপর তিনি সেটা তুলে নিতেন এবং আমি যে জায়গা থেকে মুখ লাগিয়ে খেয়েছি তিনিও ঠিক সেই জায়গায় মুখ লাগিয়ে কিছু গোসত খেতেন। এরপর তিনি কখনো কিছু পানি চাইতেন এবং ওয়াদা নিতেন যাতে প্রথমে আমি পান করি। আমি সেটা নিতাম, পান করতাম এবং রেখে দিতাম। তারপর তিনি সেটা নিতেন এবং আমি পাত্রের ৯০° যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করেছি তিনিও সেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন।”

কতই-না প্রেমময় বার্তা এমন স্বামী তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে পাঠাতেন! আর কী পরিমাণ আনন্দই-না তিনি তাকে দিতেন! নিঃসন্দেহে এই খাবার শরীরের সাথে মনকেও প্রফুল্ল রাখতো!

[১০] পানির সাথে খেজুর, কিশমিশ এবং মধু মিশিয়ে এই পানীয় প্রস্তুত করা হতো, তবে তা গাঁজানো হতো না। নবীজি ﷺ কখনোই কোন মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেন নি।

সালাতুল ইশা

ইশার আযান হওয়ার আগ পর্যন্ত নবীজি ﷺ ঘরেই থাকতেন। ইশার নামায আদায়ে তিনি কিছুটা বিলম্ব করতেন। তিনি লোকদের জন্য অপেক্ষা করতেন। তারা তাড়াতাড়ি চলে আসলে তিনি তখনই সালাত আদায় করে নিতেন, আবার তারা আসতে কিছুটা দেরি করলে তিনিও ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। যদিও তিনি ইশা কিছুটা দেরিতে আদায় করতে চাইতেন, কিন্তু এ জন্য লোকদের কষ্ট দেয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না। একবার তিনি ইশার সালাত আদায়ে বেশ দেরি করলেন। উমর রা. তখন এসে ডাক দিলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! নারী-শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে।”

নবীজি ﷺ ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তখন তাঁর মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পানি ঝরছিল। তিনি সেই পানি মুছতে মুছতে বললেন, “এটাই সালাত আদায়ের উপযুক্ত সময়। তোমাদের কষ্ট হওয়ার ভয় না থাকলে এই সময়েই আমি তোমাদের ইশার সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতাম।”

এক রাতে ইকামত দেয়ার পর একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে আমার কিছু বলার ছিল।”

নবীজি ﷺ তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে দাঁড়ালেন। লোকেরা অপেক্ষা করতে করতে প্রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল তখন। তাই রাসূল ﷺ নামায সংক্ষেপে কিন্তু নিখুঁতভাবে আদায় করলেন। আনাস রা. বললেন, “আমি এমন ইমামের সামনে আর কখনোই নামায আদায় করিনি, যার নামায রাসূলুল্লাহর থেকে বেশি সংক্ষিপ্ত কিন্তু নিখুঁত।”

নামায আদায়রত অবস্থায় অনেক সময় বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ আসত, যাদের মায়েরা সালাতে দণ্ডায়মান থাকতেন। তখন নবীজি ﷺ ওই মায়েরদের সুবিধার্থে ছোট সূরা দিয়ে নামায শেষ করে ফেলতেন। তিনি বলতেন, “আমি সালাত শুরু করি দীর্ঘ করার অভিপ্রায়ে। কিন্তু তখন আমি কোনো বাচ্চা ছেলের কান্নার আওয়াজ পাই এবং

নামায সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। কারণ, আমি উপলব্ধি করতে পারি তার জন্য তার মায়ের কী পরিমাণ উৎকণ্ঠা কাজ করছে।”

ইশার সালাত শেষ করার পর তিনি সাহাবীদের কোনো কিছু বলার থাকলে বলতেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর ওফাতের কিছুদিন পূর্বে তিনি ইশার সালাত আদায় করে দাঁড়ালেন এবং বললেন, “আজকের রাতটি সম্পর্কে ভেবে দেখো, এই রাত থেকে এক শ বছরের শেষ দিকে আজকে যারা বেঁচে আছে তাদের কেউই তখন আর জীবিত থাকবে না।”

আরও একবার কিছুটা দেরিতে ইশার সালাত শেষ করে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, “লোকেরা সালাত আদায় শেষ করে ঘুমোতে চলে গেছে। তোমরা ততক্ষণই সালাত আদায়ের মধ্যে ছিলে যতক্ষণ এর জন্য অপেক্ষা করছিলে।”

এক রাতে ইশার সালাতের ইমামতি করার জন্য তিনি অনেক বেশি ৯ বিলম্ব করলেন। সালাত শেষ করে লোকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, “একটু অপেক্ষা করো! উল্লসিত হও এ জন্য যে, এই সময়ে তোমরা ছাড়া আর কেউই সালাত আদায় করেনি। এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের ওপর তাঁর করুণা বর্ষণ করেছেন।” সাহাবীরা এই খুশির সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দচিত্তে বাড়ি ফিরলেন।

নবীজি ﷺ ইশার সালাতের পর সাহাবীদের সাথে খুব কম দিনই কথা বলতেন। কিন্তু যেদিন বলতেন, সেদিন অনেক সংক্ষেপে কথা শেষ করতেন। কারণ, তখন লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত। তারা এই সময়ে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিত। সাধারণভাবে বলতে গেলে, তিনি ইশার সালাতের পর কথা বলা তেমন একটা পছন্দ করতেন না।

সালাত শেষ করার পর তিনি মহিলাদের মসজিদ ছেড়ে ঘরে পৌঁছা অব্দি স্বস্থানেই অপেক্ষা করতেন। যখন তিনি মসজিদ থেকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য উঠতেন তখন পুরুষ সাহাবীরাও বের হয়ে যেতেন।

রাতের প্রথম গ্রহরে

নবীজি ﷺ ইশার সালাত শেষ করে ঘরে ফিরতেন এবং দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ^{১২} আদায় করতেন। তারপর নিশ্চিন্তে বসে স্ত্রীর সাথে কিছুক্ষণ গল্প করতেন। এই সময়টা তিনি তাঁর পরিবারের সাথে খোশ-গল্পেই কাটাতেন। মাঝে মাঝে কোনো অবসর সন্ধ্যায় তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথেও সাক্ষাৎ করতেন। কিছু রাতে তিনি আনসারদের সাথে সময় কাটানোর জন্য চলে যেতেন। আবার কখনো কখনো আবু বকর রা. এবং উমর রা. এর সাথে আবু বকর রা. এর বাড়িতে মিলিত হতেন। তখন তারা মুসলিম সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি বাড়ির পথে রওনা হলে তারাও তাঁর সঙ্গ উপভোগের জন্য মসজিদ পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিতেন।

পথ চলার সময় মাঝরাতে কখনো কখনো তাঁর কানে ভেসে আসত সাহাবীদের কোরআন তিলাওয়াতের সুমধুর গুঞ্জন। তিনি তখন হাঁটা থামিয়ে সেই তিলাওয়াত শুনতে থাকতেন। একরাতে আবু মূসা আল-আশআরী রা. এর বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কুরআন তিলাওয়াতের মনকাড়া সুর নবীজি ﷺ-এর কানে গিয়ে পৌঁছাল, পথচলা থামিয়ে তিনি তিলাওয়াত শুনতে লাগলেন। সকালে যখন ওই সাহাবীর সাথে তাঁর দেখা হলো তখন তিনি বললেন, “আবু মূসা, (তুমি অবশ্যই খুশি হতে, যদি দেখতে পেতে যে) গতরাতে আমি তোমার তিলাওয়াত শুনছিলাম। তোমার সুর শুনে মনে হচ্ছিল তুমি যেন দাউদ আ. এর তিলাওয়াতের একটি ছন্দ দিয়ে তিলাওয়াত করছিলে।”

একরাতে মসজিদে গিয়ে নবীজি ﷺ আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. কে কিয়ামুল লাইল (রাতের নফল সালাত) আদায়রত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি কুরআনের ৪র্থ সূরা ‘আন-নিসা’ তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি তখন আবু বকর এবং উমর রা. কে

[১২] এই দুই রাকাত পড়া সুন্নাহ, ওয়াজিব নয়। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের সাথেই কিছু সুন্নাত আদায় করা হয়, যার রাকাত সংখ্যা আবার ভিন্ন ভিন্ন। এই নিয়মিত সুন্নাতগুলো ছাড়াও নবীজি ﷺ আরও কিছু সুন্নাত আদায় করতেন। তবে সেগুলো তিনি এতোটা গুরুত্ব দিয়ে নিয়মিত আদায় করতেন না।

বললেন, “কেউ যদি কুরআনকে এমনভাবে তিলাওয়াত করতে ভালোবাসে যেভাবে এটা নাখিল করা হয়েছে, তার উচিত ইবনে উম্ম আবদকে ^{৯৩} অনুসরণ করা।”

মসজিদে প্রবেশ করে তিনি যে আওয়াজে সালাম দিতেন তা একজন জেগে থাকা মানুষের শোনার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সেই আওয়াজ ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে দিত না। মসজিদে সব সময়ই কিছু না কিছু দরিদ্র মুসলিমরা শুয়ে থাকত। তিনি ঘরে প্রবেশের পূর্বে মসজিদে সালাত আদায় করে নিতেন।

বাড়িতে পৌঁছে যখন ঘুমোতে চাইতেন তখন তিনি বিছানায় রাখা এক টুকরো কাপড় দিয়ে কোমরের নিচের অংশটুকু ঢেকে রাখতেন। তিনি তার জুব্বা খুলে রাখতেন এবং স্ত্রীদের সাথে একই চাদরের নিচে শুয়ে পড়তেন। আঁশভর্তি চামড়ার তৈরি তোশকই ছিল তাঁর বিছানা এবং একই উপাদানে তৈরি একটামাত্র বালিশ তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে ভাগ করে ঘুমোতেন। ঘুমোতে যাওয়ার সময় একটা মেসওয়াক তিনি বালিশের পাশে রেখে দিতেন, যাতে জেগে ওঠার পর তা ব্যবহার করতে পারেন। দিনে বা রাতে যখনই ঘুম থেকে উঠতেন তখনই তিনি মেসওয়াক করতেন। তাঁর মেসওয়াক করা শেষ হয়ে গেলে সেটা ধুয়ে রাখার জন্য আয়িশা রা. এর কাছে দিতেন। কিন্তু আয়িশা রা. মেসওয়াকটি ধুয়ে রাখার পূর্বে নিজে ব্যবহার করে নিতেন, যাতে রাসূলের পবিত্র লালা তাঁর মুখে প্রবেশ করে। এরপর তিনি সেটা পরিষ্কার করে নবীজি ﷺ-এর কাছে ফিরিয়ে দিতেন। নবীজি ﷺ সব সময় মেসওয়াক হাতের কাছে রাখতেন, যাতে করে তিনি সর্বদাই মুখ পরিষ্কার রাখতে পারেন। তিনি এত বেশি দাঁত মাজতেন যে, মনে হতো এই বুঝি তাঁর দাঁতগুলো সব খুলে পড়ে যাবে। যেহেতু তাঁকে ফেরেশতাদের সাথে কথা বলতে হতো, তাই হয়তো-বা তিনি চাইতেন যে তাঁর মুখ সব সময় দুর্গন্ধমুক্ত থাকুক। উপরন্তু তিনি কটু গন্ধযুক্ত কোনো ধরনের খাবারই গ্রহণ করতেন না। তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, “আমি আল্লাহর ফেরেশতাদের সামনে লজ্জাবোধ করি। এই খাবারগুলো হারাম নয়, কিন্তু আমাকে তাদের সাথে কথা বলতে হয়, যাদের সাথে তোমাদের বলতে হয় না।” তাই তিনি ঘুমোতে যাওয়ার আগে মেসওয়াকটি পাশে রাখতেন, যাতে ঘুমানোর পূর্বে এবং ঘুম থেকে ওঠার পরমুহূর্তেই দাঁত মাজতে পারেন। নবীজি ﷺ তখন তাঁর স্ত্রীদের সাথে কিছু সময় গল্প করতেন। গভীর রাতের নিস্তন্ধ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহর মতো প্রেমময় এবং সুচরিত্রবান স্বামী তাঁর প্রিয়সী স্ত্রীর সাথে কী রকম

[৯৩] ‘ইবনে উম্ম ‘আবদ এই নামে নবীজি ﷺ আদর করে শুধু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে-ই ডাকতেন।

বাক্যলাপ করতে পারেন সেটা সহজেই অনুমেয়! সেই রোমান্টিক কথোপকথনে থাকত ভালোবাসা এবং সুখানুভূতির আদান-প্রদান, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার আত্মিক বন্ধনকে আরও বেশি দৃঢ় করে তুলত।

এই মিষ্টি-মধুর আলাপচারিতার পর জৈবিক চাহিদা অনুভব করলে তিনি স্ত্রীর সাথে সহবাস করতেন। এমনকি মাসিক চলাকালীন সময়ও নবীজি ﷺ স্ত্রীকে আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত রাখতেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে কোমরের নিচের অংশ ভালোভাবে ঢেকে নিতে বলতেন এবং তারা পরস্পরের সঙ্গ^{৯৪} উপভোগ করতেন, কিন্তু সহবাস করতেন না। কাজেই এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ রকম মেশামেশির ফলে স্ত্রী অনুভব করতে পারতেন, তিনি তাঁর স্বামীর পরম আকাঙ্ক্ষিত। তাই সহবাস প্রতিরোধক এই প্রাকৃতিক উপায়ও (মাসিক) বিবাহিত দম্পতির ঘনিষ্ঠ হওয়ার মাঝখানে বাধা হতে পারে না। উম্মে সালামাহ রা. বর্ণনা করেন, “রাসূলুল্লাহর সাথে বিছানায় থাকাকালে আমার মাসিক শুরু হলো। আমি ধীরে ধীরে চাদরের নিচ থেকে বের হয়ে আসলাম। নবীজি ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি মাসিক হয়েছে?”

আমি বললাম, “অন্যান্য নারীদের মতো আমারও মাসিক হয়েছে।”

তিনি বললেন, “এটা আল্লাহ সকল নারীদের জন্যই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।”

আমি সরে পড়লাম এবং প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আবার ফিরে আসলাম। নবীজি ﷺ তখন আমাকে বললেন, “কাছে আসো এবং আমার সাথে চাদরের নিচে শুয়ে পড়ো।” সত্যিই তিনি আমাকে চাদরের নিচে নিজের খুব কাছে টেনে নিলেন।”

সাধারণত ঘুমোতে যাওয়ার পূর্বে তিনি ফরয গোসল সেরে নিতেন। তবে এর বদলে কখনো কখনো শুধু ওয়ু করে ঘুমিয়ে পড়তেন। তারপর যখন জেগে উঠতেন তখন গোসল সম্পন্ন করতেন। মাঝে মধ্যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী উভয়ে একই পাত্রে হাত ডুবিয়ে ফরজ গোসল করতেন। স্ত্রী তাঁকে বলতেন, “আমার জন্য কিছু রেখে দিন।” আবার তিনিও স্ত্রীকে অনুরূপ কথা বলতেন। এই ঘটনাটাও নবীজি ﷺ এবং তাঁর স্ত্রীদের মধ্যকার ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যখন বিছানায় যেতেন তখন তিনি বলতেন,

[৯৪] ইসলামে স্ত্রীর মাসিক চলাকালীন সময়ে সহবাস জায়েয নয়, কিন্তু চুমু খাওয়া, আলিঙ্গন করা সহ পরস্পরের সব ধরনের সঙ্গ উপভোগ জায়েয।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي، وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلَ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَمْلِكِ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَكَ كُلُّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। কেননা, এমন বহু লোক আছে যাদের প্রয়োজন পূর্ণকারী কেউ নেই এবং যাদের আশ্রয়দানকারীও কেউ নেই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার ওপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন এবং আমাকে বেহিসাব নিয়ামাত প্রদান করেছেন। সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা শুধু আল্লাহর। হে আল্লাহ, আমাদের রব ও প্রত্যেক বস্তুর রব, যার অধিকারে রয়েছে সমস্ত কিছু। আমি আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।”^{৯৫}

অতঃপর তিনি তাঁর হাত গোল করে কুরআনের শেষ তিনটি সূরা^{৯৬} পড়ে ফুক দিতেন এবং সারা শরীরে হাত বুলাতেন। তিনি তিনবার এ রকম করতেন।

বিছানায় নবীজি ﷺ ডান কাত হয়ে শয়ন করতেন এবং তাঁর ডান হাত ডান গালের নিচে রেখে বলতেন,

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أُمُوتُ وَأَحْيَا اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

“হে আল্লাহ, আপনার নামে আমার মৃত্যু হয় এবং আমি জীবিত হই।^{৯৭} হে আল্লাহ, আমাকে আপনার আযাব থেকে রক্ষা করুন, যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনর্জীবিত করবেন।”^{৯৮}

নবীজি ﷺ ঘুমানোর পূর্বে আরও কিছু দুআ পড়তেন। এখানে কিছু উল্লেখ করা হলো :

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَةِ، وَالْإِنْجِيلِ، وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، أَنْتَ

[৯৫] মুসনাদ আহমদ : ৫৯৮৩

[৯৬] এই তিনটি সূরা হচ্ছে সূরা ‘আন-নাস’, ‘আল-ফালাক’ এবং ‘আল-ইখলাস’

[৯৭] ঘুম হচ্ছে মৃত্যুর ন্যায় এবং জেগে ওঠা হচ্ছে জীবিত হওয়ার ন্যায়।

[৯৮] বুখারী : ৬৩১৪; মুসনাদ আহমদ : ৪২২৬

أَخِذْ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ
بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ
دُونَكَ شَيْءٌ وَأَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ

“হে আল্লাহ, হে সপ্ত আকাশের রব, যমিনের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব ও প্রত্যেক বস্তুর রব, হে শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী, হে তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী, আমি প্রত্যেক এমন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যার (মাথার) অগ্রভাগ আপনি ধরে রেখেছেন (নিয়ন্ত্রণ করছেন)। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না; আপনি সর্বশেষ, আপনার পরে কোনো কিছু থাকবে না; আপনি সবকিছুর ওপরে, আপনার ওপরে কিছুই নেই; আপনি সর্বনিকটে, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই, আপনি আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদের অভাবগ্রস্ততা থেকে অভাবমুক্ত করুন।”^{৯৯}

بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنِيَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكِّ
رَهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي التَّدْيِ الْأَعْلَى

“আমার রব, আমার পাপসমূহ ক্ষমা করুন, শয়তানকে পর্যুদস্ত করুন, আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমার সৎকর্মের পাল্লা ভারী করে দিন এবং নেককারদের মধ্যে আমাকে शामिल করে নিন, যাদের আপনি সর্বোৎকৃষ্ট বন্ধুর^{১০০} সাথে রাখবেন।”^{১০১}

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَسَلْتُ نَفْسِي، وَفَوَّضْتُ إِلَيْكَ أَمْرِي، وَالْجَانُتُ إِلَيْكَ ظَهْرِي،
وَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ وَجْهِي، رَهْبَةً مِنْكَ، وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا
مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

“হে আল্লাহ, আমি নিজেকে আপনার কাছে সঁপে দিলাম। আমার যাবতীয় বিষয় আপনার কাছেই সোপর্দ করলাম, আমার চেহারা আপনার দিকেই ফিরিলাম, আর আমার পৃষ্ঠদেশকে আপনার দিকেই ন্যস্ত করলাম; আপনার প্রতি অনুরাগী হয়ে এবং

[৯৯] আবু দাউদ : ৫০৫১

[১০০] সর্বোৎকৃষ্ট বন্ধু বলতে আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে, যার কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

[১০১] আবু দাউদ : ৫০৫৪

আপনার ভয়ে ভীত হয়ে। একমাত্র আপনার নিকট ছাড়া আপনার (পাকড়াও) থেকে বাঁচার কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং কোনো মুক্তির উপায় নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনার নাযিলকৃত কিতাবের ওপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর ওপর।” ১০২

তা ছাড়া তিনি কুরআনের কিছু সূরাও তিলাওয়াত করতেন। যেমন : সূরা আস-সাজদাহ, আল-মূলক, আয-যুমার, আল-ইসরা ইত্যাদি।

তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। তিনি ঘুমানোর পর কিছু সময় পর্যন্ত তাঁর নিশ্বাস শোনা যেত। দিনে ঘুমাতে গেলে তিনি বলতেন, “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি সবকিছুর ওপর বিজয়ী, আসমান-যমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক, সর্বশক্তিমান, ক্ষমাশীল।”

রাতে ঘুম ভেঙে গেলে পুনরায় শয্যা গ্রহণের পূর্বে নবীজি ﷺ মেসওয়াক দিয়ে দাঁত মেজে নিতেন। তিনি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতেন। খুব সম্ভবত এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দীর্ঘতম ঘুমের সময়।

গভীর রাতে নবীজি ﷺ-এর সাথে

মাঝরাতে বা এর কিছু আগে অথবা পরে নবীজি ﷺ জেগে উঠতেন। তিনি উঠে বসতেন এবং ঘুমের রেশ কাটাতে হাত দিয়ে নিজের মুখ মুছতেন। তারপর মেসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন। এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীর রাতের নিস্তর প্রকৃতির মাঝে মহান রবের সৃষ্টি-নৈপুণ্য নিয়ে ভাবনায় মগ্ন হতেন। এ সময় তিনি কুরআন থেকে নিচের অংশটুকু তিলাওয়াত করতেন :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي
الْأَلْبَابِ ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ، رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
أَنْصَارٍ ، رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
رَبَّنَا فَاعْفُ رُفْنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ، رَبَّنَا وَآتِنَا
مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسْلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ،
اسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ
، لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ
جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ، لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমীন সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে) পরওয়ারদেগার, এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদের তুমি দোষখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। হে আমাদের পালনকর্তা, নিশ্চয় তুমি যাকে দোষখে নিষ্ক্ষেপ করলে তাকে সব সময়ে অপমানিত করলে; আর জালেমদের জন্যে তো সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনো; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ করো এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদের তুমি অপমানিত কোরো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না। অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দুআ (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সমস্ত লোক, যারা হিজরত করেছে, তাদের নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের ওপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব। এবং তাদের প্রবিষ্ট করব জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয়। এটা হলো সামান্য ফায়দা, এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান। কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের

পালনকর্তাকে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম। আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার ওপর অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু তাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর ওপর, আল্লাহর সামনে বিনয়ানত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওয়া করে না, তারাই হলো সে লোক, যাদের জন্যে পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ যথাশীঘ্র হিসাব চুকিয়ে দেন। হে ঈমানদারগণ, ধৈর্যধারণ করো এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।” ১০০

নবীজি ﷺ এরপর বিছানা থেকে উঠে দেয়ালে ঝুলানো পানির মশকটি নিয়ে তা থেকে কিছু পানি অন্য একটি পাত্রে ঢালতেন। যথাসম্ভব কম পানি দিয়ে অতঃপর তিনি তাঁর উয়ু সম্পন্ন করতেন। এরপর তিনি তাঁর জুব্বা পরিধান করতেন এবং শোয়ার সময় কোমরের নিচের অংশ ঢাকার জন্যে পরা কাপড়টি খুলে ফেলতেন। অতঃপর তিনি তাঁর রাতের নামায শুরু করতেন।

রাত্রিকালীন ইবাদাতের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে তিনি মাঝে মাঝে সালাতের পূর্বে কিছু দুআ এবং যিকির করতেন। আয়িশা রা. বর্ণনা করেন, ঘুম থেকে ওঠার পর নবীজি ﷺ এই যিকিরগুলো দশবার করে পড়তেন : اللَّهُ أَكْبَرُ আল্লাহ্ আকবার, অর্থাৎ, ‘আল্লাহ মহান’; الْحَمْدُ لِلَّهِ, অর্থাৎ, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর’; سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ, অর্থাৎ, ‘আল্লাহ মহাপবিত্র, তিনি মহামহিম’; سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ, অর্থাৎ, ‘রাজাধিরাজ মহাপবিত্র আল্লাহ মহান’; أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ, অর্থাৎ, ‘আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি’; لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, অর্থাৎ, ‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই’। তারপর আরও দশবার বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

‘আমার রব, আমি দুনিয়ার সংকীর্ণতা এবং আখেরাতের কঠিন অবস্থা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।’ এরপর তিনি নামায শুরু করতেন। ১০৪

[১০৩] সূরা আল-ইমরান ৩ : ১৯০-২০০

[১০৪] আবু দাউদ : ৫০৮৫

দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত সালাত দিয়ে তিনি কিয়ামুল লাইল শুরু করতেন। জামাতের সালাতে ইমামতি করার সময় তিনি নামায সংক্ষেপে আদায় করলেও একাকী অন্য যেকোনো মানুষের তুলনায় তাঁর সালাত দীর্ঘতর হতো। এমনকি তিনি রাতের সালাতের কিয়াম, রুকু-সিজদাহ, দুআ—সবকিছুই দীর্ঘ সময় ধরে আদায় করতেন। আর তিনি এরকমটা করতেন আল্লাহরই নির্দেশে,

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا

“রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে।” ১০৫

তাঁর সমস্ত আবেগ-অনুভূতি এবং মনোযোগ নামাযেই কেন্দ্রীভূত থাকত। রাতের সালাতে তিনি এতটাই নিমগ্ন হয়ে যেতেন যেন তাঁর আত্মা রবের কাছ থেকে আসা জ্যোতির খোঁজ পেতে সর্বোচ্চ সম্মানিত বান্দাদের কাতারে মিলিত হতো। মনে হতো যেন তিনি আরশে আযীমের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর রবের সাথে নিভৃত আলাপে রত। তিনি সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও সুন্দর বিশেষণে স্বীয় রবের প্রশংসা করতেন। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাও ছিল অনন্য। মানুষ যা কিছু আল্লাহর কাছে চাইতে পারে নবীজি ﷺ-এর দুআ ছিল নিঃসন্দেহে সেই সমস্ত কিছুর সারাংশ।

মেরাজের রাতে তাঁর জন্যই উর্ধ্বাকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছিল। তিনি এত ওপরে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, তাক্বদীর লেখক ফেরেশতাদের কলমের খসখস আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পেয়েছিলেন।

রাসূল ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম জ্ঞান, নিখুঁত ঈমান এবং সংশয়হীন অন্তঃকরণ লাভ করেছিলেন। তাঁর বলা কথাগুলো সন্দেহাতীতভাবে সত্য। তাঁর ভাষায়, “তোমাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে জানি এবং তাঁকে সর্বাধিক ভয় করি।”

তিনি এমন একজন বান্দার মতো সালাত শুরু করতেন যে কিনা তাঁর রবের প্রশংসা করে, তাঁকে ভালোবাসে এবং তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অন্তরে লালন করে। তাঁর সালাতের শুরুতেই থাকত ভাবাবেগপূর্ণ শব্দাবলি দিয়ে রবের প্রশংসা বর্ণনা। যেমন :

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ،
اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“হে আমার রব, জিবরাইল, মীকাঈল এবং ইস্রাফীলের রব! আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা! দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কেই তুমি সবিশেষ অবহিত। তোমার বান্দারা যে সকল বিষয় নিয়ে বিবাদ করে তুমিই তার মীমাংসাকারী। মানুষ যে সকল বিষয়ে মতানৈক্য করে সে সকল বিষয়ের সঠিক দিক-নির্দেশনা তুমি আমাকে দাও। নিশ্চয়ই যাকে চাও তাকেই তুমি সৎপথ প্রদর্শন করো।” ১০৬

সালাতের শুরুতে করা তাঁর আরও একটি দুআ নিম্নরূপ :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ
حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ
أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفُ عَنِّي مَا قَدَّمْتُ وَآخَرْتُ
وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“হে আমাদের রব, সকল প্রশংসা শুধুই তোমার। আসমান এবং যমীনের মাঝে যা কিছু আছে তুমিই সে সবকিছুর আলো! সকল প্রশংসা তোমারই জন্যে। তুমিই আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত কিছুর রাজাধিরাজ। যাবতীয় প্রশংসা তোমার জন্য নির্ধারিত। তোমার কালিমা সত্য! জ্ঞানাত সত্য! জাহান্নাম সত্য! নবী-রাসূল সত্য! মুহাম্মদ সত্য এবং কেয়ামতও সত্য! হে আল্লাহ, আমি তোমারই কাছে আত্মসমর্পণ করি, তোমার ওপরই নির্ভর করি এবং তোমাকেই বিশ্বাস করি, তোমার কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন, তোমার ব্যাপারেই আমরা বিতর্ক করি, তোমারই কাছে সিদ্ধান্তের জন্য ধরনা দিই। আমার পূর্বের এবং পরের গোনাহসমূহ মাফ করে দাও। মাফ করে দাও সেসব গুনাহ, যা আমি গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা তুমি আমার থেকে বেশি জানো। তুমিই

| এগিয়ে দাও, তুমিই পিছাও। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।” ১০৭

অন্য একটি দুআ হচ্ছে,

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفُ
لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ
لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا
أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ
وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

“আমার মুখ পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সেই সত্তার দিকে ঘুরালাম, যিনি আসমান এবং যমীনকে সৃষ্টি দিয়েছেন। যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার সালাত, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু একমাত্র রবের জন্যই, যিনি সারা জাহানের প্রভু। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে এবং আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা রবের কাছে আত্মসমর্পণ করে। হে আমার রব, তুমিই শাহানশাহ! তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তুমিই আমার মালিক এবং আমি তোমার গোলাম। আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি এবং নিজের কৃত গোনাহসমূহ স্বীকার করছি। আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দাও। তুমি ব্যতীত আর কারওই গুনাহ মাফের ক্ষমতা নেই। আমাকে সর্বোত্তম রীতিনীতির শিক্ষা দাও, তুমি ছাড়া যা আর কেউই শিক্ষা দান করতে পারে না। খারাপ অভ্যাসসমূহ থেকে তুমি আমাকে দূরে রাখো; কারণ, তুমি ছাড়া সেগুলো থেকে দূরে রাখার ক্ষমতা আর কারও নেই। আমি তোমাকেই ডাকি। তোমার হাতেই সমস্ত কল্যাণের চাবি, আর না কোনো অকল্যাণ তোমার নাগাল পায়। আমি তোমার জন্যই বাঁচি। তুমি পবিত্র, মহিমাধিত। আমি তোমার কাছেই ক্ষমা চাইছি এবং তোমার কাছেই তাওবা করছি।” ১০৮

রাতের নামাযে নবীজি ﷺ স্পষ্টভাবে এবং ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যখনই তিনি আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্বলিত কোনো আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চেয়ে দুআ করতেন, শাস্তির আয়াত তিলাওয়াতের সময় রবের কাছে শাস্তি থেকে আশ্রয় চাইতেন, আর যখন আল্লাহর গুণগান-সম্বলিত কোনো আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন তিনি আল্লাহর গুণকীর্তন করতেন।

নবীজি ﷺ-এর রাতের নামায ছিল অনেক দীর্ঘ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, “আমি আল্লাহর রাসূলের সাথে এক রাতে সালাত আদায় করলাম। তিনি এত দীর্ঘ সালাত আদায় করেছিলেন যে, আর একটু হলেই আমি অপ্রীতিকর কিছু একটা করে ফেলতাম।”

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ‘তিনি কী করতে চাইছিলেন?’

আব্দুল্লাহ রা. জবাব দিলেন, “আমি নামায ত্যাগ করে বসে থাকার চিন্তা করেছিলাম।”

নবীজি ﷺ স্বল্পসংখ্যক রাকাতে লম্বা সূরা দিয়ে নামায আদায় করতেন। তাঁর রাতের নামায কখনোই তের রাকাতের বেশি হয়নি। তিনি যতক্ষণ দাঁড়ানো অবস্থায় কাটাতেন, রুকুতেও প্রায় ততক্ষণই থাকতেন। রুকুতে নবীজি ﷺ বলতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي
خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصْبِي

“হে আমার রব, আমি তোমারই জন্য রুকু করছি এবং তোমাতেই বিশ্বাস স্থাপন করছি; একমাত্র তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করছি এবং শুধু তোমারই ওপর নির্ভর করি। তুমিই আমার রব! আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাড়, আমার স্নায়ু তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় অবনত।” ১০৯

জীবনসায়াহে এসে নবীজি ﷺ প্রায়ই তাঁর রুকু-সিজদায় পড়তেন :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, তোমার পূতপবিত্রতা ঘোষণা করি, তোমার প্রশংসাসহ। হে আল্লাহ, আমায় তুমি মাফ করে দাও।” আয়িশা রা. তাঁর কাছে এ রকম করার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, “আমার রব আমাকে বলেছিলেন যে, শীঘ্রই

আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশ পাবে। আর সেটা যখনই আমার দৃষ্টিগোচর হবে তখনই যেন আমি বলি :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

‘সকল প্রশংসা এবং পূতপবিত্রতা আল্লাহরই। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করছি।’

আর আমি ইতিমধ্যে সেই নিদর্শন অবলোকন করেছি। তা হলো,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
(٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)

“যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি দলে দলে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী।” ১১০

এই আয়াতগুলো ছিল তাঁর আসন্ন মৃত্যুর সংকেত, তাঁর রব এবং সর্বোত্তম বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার সুসংবাদবাহী।

তাঁর সিজদাহও ছিল প্রায় ঝুঁকুর মতোই দীর্ঘ। সিজদায় গিয়ে তিনি এই দুআগুলো বলতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ
وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“হে আল্লাহ, আমি তোমারই জন্য সিজদা করছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছি। আমার মুখমণ্ডল সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাতে কান এবং চোখ স্থাপন করেছেন। মহিমাষিত আল্লাহ সর্বোত্তম স্রষ্টা।” ১১১

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّةً، وَجِلَّةً، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ عِلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

[১১০] সূরা আন-নাসর ১১০ : ১-৩

[১১১] আবু দাউদ : ৭৬০

“হে আল্লাহ, আমার ছোট-বড়, পূর্বের-পরের, গোপন-প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও।” ১১২

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই তোমার অসম্প্রতি হতে তোমার সম্প্রতির মাধ্যমে, আর আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে তোমার শাস্তি হতে। তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করা যায় না। তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য নিজের প্রশংসা যেকোনো তুমি নিজে করেছ।” ১১৩

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“ফেরেশতা এবং রুহুল কুদুসের প্রতিপালক স্বীয় সন্তায় পূত এবং গুণাবলিতেও পবিত্র।” ১১৪

কতই-না মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন নবী মুহাম্মদ ﷺ! তিনি বিনশ্রুতিতে নিস্তর্র গভীর রাতে তাঁর রবকে ডাকতেন। তিনি বারংবার তাঁকে ডাকতেন প্রশংসা এবং পবিত্রতাসহ, স্বীকারোক্তি দিতেন তাঁর প্রভুত্ব এবং ঐশ্বর্যের। বিনীতভাবে এই বাক্যগুলো আওড়ানোর সময় এবং আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দেয়ার এই মুহূর্তে কী মহিমাঘিত মনোদিগন্তেই না নবীজি ﷺ-এর রুহ উদ্ভাসিত হতো! আমাদের কল্পনায় যেন ভেসে ওঠে, পৃথিবীর সমস্ত কিছুই এ সময় তাঁকে শুনছে এবং আকাশের নক্ষত্ররাজিও তখন তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে। অতঃপর বিস্ময়াভিভূত চিত্তে একে অপরকে বলছে, এই সেই মানুষ, যার সম্বন্ধে আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

وَإِذْ كَرَّمَاسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبَتُّلًا

“কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি মগ্ন হও।” ১১৫

[১১২] আবু দাউদ: ৮৭৮

[১১৩] আবু দাউদ: ৮৭৯

[১১৪] আবু দাউদ: ৮৭২

[১১৫] সূরা আল-মুযায্মিল ৭৩:৮

নবীজি ﷺ রাতের এক-ষষ্ঠাংশে পৌঁছার আগ পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে তিলাওয়াত, আবেগপূর্ণ দুআ, আর মহান রবের প্রশংসায় রত থাকতেন। ততক্ষণে তাঁর রাতের নামায শেষ হয়ে যেত এবং শুধু বিতর সালাতই বাকি থাকত। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জাগিয়ে দিতেন, যাতে করে তিনিও নবীজি ﷺ-এর সাথে বিতর আদায় করে নিতে পারেন। তিনি তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন। সাধারণত তিনি প্রথম রাকাতে সূরা আল-আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল-কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা আল-ইখলাস তিলাওয়াত করতেন। বিতর সালাতের শেষে তিনি বলতেন :

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

“হে আল্লাহ, তোমার ক্রোধের বদলে আমি তোমার সন্তুষ্টি কামনা করছি এবং তোমার শাস্তির বদলে তোমার ক্ষমা। আমি আশ্রয় চাইছি তোমার কাছে তোমার শাস্তি থেকে। আমি তোমার নিয়ামতরাজি গুনে শেষ করতে অক্ষম, আর না আমি তোমার প্রশংসা করতে সক্ষম, ঠিক যেমনটা করা উচিত। আমি তদ্রূপ তোমার প্রশংসা করছি তুমি নিজে যেরূপ তোমার সম্বন্ধে করেছ।” ১১৬

বিতর শেষে তিনি তিনবার বলতেন :

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

“সকল প্রশংসা রাজাধিরাজ আল্লাহর, তিনি পবিত্র।” ১১৭

তিনি তৃতীয়বার একটু দীর্ঘ করে বাক্যটি বলতেন।

নবীজি ﷺ এমন ঘরে রাতের নামায আদায় করতেন যেখানে আরাম-আয়েশের লেশমাত্র ছিল না। তাঁর ঘরে ছিল না কোনো আলোর বন্দোবস্ত। খড়ের চাটাই কিংবা স্ত্রীর তোশকই ছিল তাঁর সিজদার স্থান। নবীজি ﷺ-এর সালাত আদায়কালে তাঁর স্ত্রী তাঁর সামনে শুয়ে থাকতেন। যখন তিনি সিজদায় যেতে চাইতেন তখন স্ত্রীকে স্পর্শ করলে স্ত্রী তার পা সরিয়ে নিতেন। নবীজি ﷺ দাঁড়িয়ে গেলে তিনি আবার তাঁর পা প্রসারিত করতেন।

কদাচিৎ নবীজি ﷺ মসজিদে রাতের সালাত আদায়ের জন্য যেতেন। খুব সম্ভবত তাঁর

স্ত্রীর ঘুম যাতে ভেঙে না যায় এ কারণেই তিনি মাঝে মাঝে মসজিদে যেতেন। আয়িশা রা. বর্ণনা করেন, “আমি একরাতে নবীজিকে বিছানায় না পেয়ে তাঁকে খুঁজতে বের হলাম। আমার হাত তাঁর পায়ের পাতা স্পর্শ করল যেহেতু তাঁর পদযুগল খাড়া হয়ে ছিল।”^{১১৮} তিনি বলছিলেন :

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

“হে আমার রব, আমি তোমার অসন্তুষ্টির বদলে সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি, তোমার শাস্তির বদলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি তোমার কাছে তোমার শাস্তি হতে পানাহ চাইছি। আমি তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে অপারগ। তুমি নিজের যেরূপ প্রশংসা করেছ আমিও তদ্রূপ তোমার প্রশংসা বর্ণনা করছি।”^{১১৯}

তিনি আরও বলেন, “একরাতে নবীজিকে ﷺ বিছানায় না দেখে আমি ভাবলাম তিনি বুঝি তাঁর অন্য স্ত্রীদের কাছে গিয়েছেন। আমি তাঁকে কিছুক্ষণ খোঁজার পর ঘরে ফিরে আসলাম। ঘরে ফিরে তাঁকে রুকু বা সিজদারত অবস্থায় বলতে শুনলাম :

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“সকল মহিমা এবং প্রশংসা শুধু তোমারই প্রভু। তুমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই।”

তখন আমি চিন্তা করলাম, ‘আপনি কতই-না আদর্শবান হে রাসূলুল্লাহ, আপনি কতই-না উত্তম কাজে ব্যস্ত ছিলেন যেখানে আমি আচ্ছন্ন ছিলাম পুরোই বিপরীত চিন্তায়।’^{১২০}

[১১৮] এর মানে হচ্ছে নবীজি ﷺ তখন সিজদারত ছিলেন।

[১১৯] আবু দাউদ : ৮৭৯

[১২০] মুসনাদ আহমদ : ২৫১৭৮

গভীর রাতের ভ্রমণবীথি

রাত্রিকালীন ইবাদাতের সর্বোৎকৃষ্ট সময় অর্থাৎ, রাতের শেষ প্রহরের বেলায় নবীজি ﷺ কখনো কখনো কন্যা ফাতিমা রা. এবং তার স্বামী আলী রা. এর ঘরে যেতেন। তিনি তাদের ডেকে বলতেন, “তোমরা কি উঠে সালাত আদায় করবে না?” আলী রা. বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার নবীজিকে ﷺ বলেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আমরা শুধু ফরজ সালাতগুলোই আদায় করি। আমাদের রুহ তো থাকে রবের কজায় (ঘুমের সময়)। তিনি যদি আমাদের জীবিত (জাগ্রত) করতে চান, তবে তিনি তা-ই করবেন।” আলী রা. যখন এই উক্তিটি করলেন তখন নবীজি ﷺ তার সাথে কোনো কথা না বলেই চলে গেলেন। আলী রা. শুনতে পেলেন, চলে যাওয়ার সময় নবীজি ﷺ সজোরে তাঁর উরুতে আঘাত করে বলছেন, ‘আমরা শুধু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া ফরজ সালাতগুলোই আদায় করি। “মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বিতর্ককারী।”’^{১২১}

তাঁর জীবৎকালের শেষের দিকে নবীজি ﷺ রাতের বেলা আল-বাকী গোরস্থানে কবরবাসীদের জন্য দুআ করতে যেতেন। আয়িশা রা. আল-বাকী গোরস্থানে যাওয়ার প্রথম রাতটি সম্পর্কে বর্ণনা করেন, “সে রাতে নবীজি ﷺ আমার সাথে ছিলেন। তিনি পাশ ফিরলেন এবং ওপরের পোশাক খুলে ফেললেন। তারপর জুতা খুলে নিজের পায়ের কাছে রাখলেন এবং নিচের পোশাকের প্রান্তভাগ বিছানায় রেখে শুয়ে পড়লেন। আমি ঘুমিয়ে আছি ভাবার আগ পর্যন্ত তিনি এভাবেই থাকলেন। এরপর খুব সাবধানে তিনি তাঁর ওপরের পোশাক পরিধান করলেন, অতি শান্তভাবে জুতা জোড়া পরলেন এবং দরজা খুলে বের হয়ে গেলেন। অতঃপর কোনো শব্দ না করেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ আমার জামা গায়ে চাপালাম, মাথা ঢাকলাম, জিলবাব^{১২২} পরলাম এবং তাঁকে অনুসরণ করে চলা শুরু করলাম। তিনি আল-বাকী’তে গিয়ে

[১২১] সূরা আল-কাহাফ ১৮:৫৪

[১২২] সর্বাঙ্গ-আচ্ছাদনকারী লম্বা পোশাক

দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তিনবার তাঁর হাত উত্তোলন করলেন। তিনি তারপর ঘুরে গেলেন এবং আমিও ঘুরলাম, দ্রুত হাঁটা শুরু করলেন এবং আমিও দ্রুত হাঁটা শুরু করলাম, তিনি ধীরে ধীরে দৌড়ানো শুরু করলেন এবং আমিও ধীরে দৌড়াতে থাকলাম, তারপর দ্রুত দৌড়ানো শুরু করলেন এবং আমিও সেটাই করলাম। আমি তাঁর থেকে দ্রুতগতিতে ঘরে পৌঁছে গেলাম। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করলেন তখন আমি বিছানায় প্রায় শুয়ে পড়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী ব্যাপার আয়িশা? তোমাকে বিচলিত দেখাচ্ছে?’

আমি বললাম, ‘কিছুই হয়নি।’

তিনি তখন বললেন, ‘তুমি আমাকে বলবে নয়তো আল্লাহই আমাকে জানিয়ে দেবেন, যিনি সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।’

আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল, অন্য সবার থেকে আপনিই আমার সবচেয়ে প্রিয়।’ তারপর আমি তাঁকে সবকিছু খুলে বললাম।

তিনি তখন বললেন, ‘তুমিই কি তবে সেই কালো ছায়া, যা আমি আমার সামনে দেখেছিলাম?’

আমি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলাম। তিনি আমার বুকে একবার মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললেন, ‘তুমি কি ভেবেছিলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করতে পারেন?’

আমি জবাব দিলাম, ‘মানুষ যা কিছুই গোপন করে আল্লাহ তাঁর সবই জানেন। হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম।’

নবীজি ﷺ বললেন, ‘যখন তুমি আমাকে দেখছিলে তখন জিবরাইল আ. আমার কাছে এসে বাইরে যাওয়ার জন্য ডাক দিলেন এবং তোমার কাছ থেকে বিষয়টা গোপন রাখলেন। আমিও তোমাকে না শুনিয়ে তাঁর ডাকের জবাব দিলাম। তুমি যখন তোমার কাপড় ছাড়ো তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করেন না। আমি ভাবলাম, তুমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছ, তাই তোমাকে জাগাতে চাইনি। কারণ, আমি মনে করেছিলাম, আমি চলে যাওয়ার পর তুমি হয়তো একাকী অনুভব করবে। জিবরাইল আ. আমাকে জানানলেন, আল-বাকীতে গিয়ে সেখানকার মৃতদের জন্য দুআ করতে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।’

আয়িশা রা. বলতে থাকলেন, ‘আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম কেমন করে আমি কবরে

শায়িত মৃতদের সম্বোধন করতে পারব। তিনি আমাকে এই দুআ করতে বললেন :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
بِكُمْ لَاحِقُونَ

“এই স্থানের বিশ্বাসী মুসলিমদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাঁর রহমত বর্ষিত করুন তাদের ওপর, যারা আগে চলে গেছেন এবং যারা হবেন তাদের অনুগামী। আল্লাহ চাইলে শীঘ্রই আমরা আপনাদের সাথে মিলিত হব।” ১২৩

এরপর থেকে প্রতিরাতেই তিনি শেষ-রাতে আল-বাকীতে যেতেন। নবীজি ﷺ বলতেন :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، فَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ غَدًا
مُّوْجِلُونَ، تُؤْجَلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

“তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, বিশ্বাসী লোকদের এই সমাগমে। তোমাদের সাথে যার প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে তা তোমরা পেয়েছ। তোমরা অপেক্ষা করছ বিচার দিবসের। আল্লাহ চাইলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।” ১২৪

কতই-না দয়ার নবী তিনি, রাতের আঁধারে, যিনি প্রিয় সাহাবীদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দুআ করতেন। সেইসব সাহাবীদের কবরের সামনে, যারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন ইসলামের বিজয় দেখার আগেই। যখন দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছিল তই তো তখন নবীজি ﷺ তাঁর সহযোদ্ধা প্রিয় সহচরদের স্মরণ করছিলেন। তারা তাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছিলেন যখন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল হাতে-গোনা এবং এই সংখ্যালঘু মুসলিমরা তখন শত্রুদের অত্যাচার-নির্যাতনের কবলে অত্যন্ত কঠিন সময় পার করেছিলেন। তারা দুনিয়ায় কোনো প্রতিদান না পেয়েই বিদায় নিয়েছিলেন।

সেই সময়, নবীজি ﷺ-এর কাছে সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকে দলে দলে প্রতিনিধিদল এসে ইসলাম গ্রহণ করছিল। অথচ ইসলামী ভূখণ্ডের সম্প্রসারণ কিংবা অসংখ্য জাতি-গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পরও নবীজি ﷺ তাদের কথা ভুলে যাননি, যারা আগেই পৃথিবী ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ ক’টা দিন নিয়মিত কিছুটা সময় তাদের

[১২৩] মুসনাদ আহমদ : ২২৯৮৫

[১২৪] মুসনাদ আহমদ : ২৫৪৭১

কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কথা স্মরণ করে তাদের জন্য দুআ করে কাটিয়েছেন।
ওই সময়টাতে নবীজি ﷺ তাঁর মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। তিনি সর্বোত্তম বন্ধুর সাথে
সাক্ষাতের প্রস্তুতি হিসেবে জীবিত এবং মৃত উভয় সাথীদের কাছ থেকে যেন বিদায়
নিচ্ছিলেন।

ভোরের পূর্বে ঈষৎ ঘুম

রাতের এক-ষষ্ঠাংশ বাকি থাকতে অর্থাৎ প্রায় শেষ প্রহরে নবীজি ﷺ দীর্ঘ কিয়ামুল লাইল, তাসবীহ, দুআ, নিকটাত্মীয়দের প্রতি স্নেহশীল আচরণ এবং মৃত সাথীদের কল্যাণকামনার পর কিছু সময় বিশ্রাম নেয়ার উদ্দেশ্যে আবার বিছানায় যেতেন। ফজর সালাত এবং দিনের কর্মব্যস্ততার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে তিনি তখন ভাতঘুম ঘুমাতে। এভাবেই সুবহে সাদিকের প্রারম্ভের সময়টুকু নবীজি ﷺ-এর ঈষৎ ঘুমেই কেটে যেত। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রা. বলেন, “নবীজি ﷺ যে রাতেই আমার সাথে থাকতেন, সুবহে সাদিকের শুরুর সময়টুকুতে তিনি নিদ্রা যেতেন।”

রাতের আঁধার কেটে ভোরের আলো ফোঁটার সময় বিলাল রা. এর সুমধুর আযানের ধ্বনি যখন মদীনার নিস্তব্ধতা ভেঙে দিত তখন নবীজি ﷺ জেগে উঠতেন। প্রিয় রাসূল ﷺ তাঁর একেকটা নতুন দিন শুরু করতেন আযানের সুর শুনে, যা নববী সুসংবাদের বার্তা এবং ইসলামের আলোকিত বাণী বহন করে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতো মদীনা নগরীর অলিতে-গলিতে।

নবীজি ﷺ-এর সমগ্র দিনের কার্যবিধির আলোকে একটি পর্যালোচনা

নবীজি ﷺ-এর একেকটা দিন যেন তাঁর সমগ্র জীবনের এক টুকরো প্রতিচ্ছবি। তাঁর কাটানো প্রতিটা মুহূর্তই ওহীর সুগভীর বার্তা ছড়িয়ে দিত :

১ম.

নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনের জন্য নবীজি ﷺ প্রত্যেকটা দিনই পরিকল্পিতভাবে কাটাতেন। মানবেতিহাস কখনোই আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর মতো অন্য কারও থেকে এত ব্যাপক সফলতার সাক্ষী হতে পারেনি।

দুই.

নবীজি ﷺ-এর নিত্যদিনের যে জিনিসটা প্রথমেই মন কেড়ে নেয় তা হলো নবীজির দিনলিপির নির্মল স্বচ্ছতা, যা সর্বদাই আলো বিকিরণ করে যায়। তাঁর জীবনের কোনো অংশই আমাদের অগোচরে রয়ে যায়নি। প্রিয় নবীজি ﷺ-এর নববী জিন্দেগীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশটুকুও আমাদের কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। তিনি ঘরের ভেতরে কী করতেন, কীভাবে ঘুমাতে, শয়নকালে স্ত্রীদের সাথে কীভাবে সময় কাটাতেন তার সবকিছুই আমরা জানি। এমনকি ঘুমের সময় তাঁর নিশ্বাসের শব্দটুকুও যেন আমাদের কানে ঝংকার তোলে। ঘুম ভেঙে নবীজি ﷺ-এর পবিত্র মুখখানা দিয়ে প্রথমেই কী উচ্চারিত হতো তাও আমাদের অজানা নয়।

যখন নবীজি ﷺ-এর দৈনিক কার্যাবলি অধ্যয়ন করা শুরু করেছিলাম, মনে হচ্ছিল নিজের জন্মদাতা পিতার থেকেও আমি তাঁকে বেশি চিনি। তাঁর ছিল এক জ্যোতির্ময় জীবন, যিনি ছিলেন দীপ্তিমান সূর্যের নিচে হেঁটে চলা এক কিংবদন্তি বার্তাবাহক।

তিন.

তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম যখন আপনি অনুসরণ করতে শুরু করবেন, কেবল তখনই

অনুধাবন করতে পারবেন তাঁর বাণীর মর্মার্থ : “সালাত হচ্ছে আমার চোখের শীতলতা।” সালাতেই তাঁর দিনের বড় একটা অংশ অতিবাহিত হতো; হোক সেটা ফরজ কিংবা নফল সালাত, অথবা কিয়ামুল লাইল। সালাতের সময়টুকু নবীজি ﷺ-এর কর্মব্যস্ত দিনে মানসিক স্বস্তি এনে দিতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করত। তাঁর গুরুদায়িত্ব পালনে যে অতিরিক্ত শক্তি এবং বরকতের দরকার ছিল; মনে হয় যেন সালাতের মাধ্যমেই তিনি তা লাভ করতেন। প্রতিবার সালাত আদায়ের পর তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা নবরূপ লাভ করত এবং মানসিক শক্তিও বৃদ্ধি পেত। সালাত ছিল তাঁর শক্তি এবং স্বস্তির উৎস। কোনো সালাত বাকি থেকে গেলে তিনি অবসর পাওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করে নিতেন। সালাতের প্রতি তাঁর আকুলতা প্রকাশ করে নবীজি ﷺ বলেন, “বিলাল, আমাদের সালাতের প্রশান্তি দাও।” “সালাতের প্রশান্তি”—এই বাক্যাংশটাই সালাতের প্রতি তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। সৃষ্টিকর্তার সাথে নবীজি ﷺ-এর পূর্ণতাপ্রাপ্ত সম্পর্কের বাস্তবরূপই যেন এতে ফুটে ওঠে।

ইবনুল কায়্যিম রাহ. বর্ণনা করেন যে, নবীজি ﷺ দৈনিক ৪০ রাকাত সালাত নিয়মিত আদায় করতেন। এর মধ্যে ছিল ১৭ রাকাত ফরয সালাত, ১০ বা ১২ রাকাত নিয়মিত সুন্নাত সালাত এবং ১১ অথবা ১৩ রাকাত কিয়ামুল লাইল। এর বাইরে কোনো নফল সালাতই তিনি নিয়মিত আদায় করেননি। সেগুলোর মধ্যে আছে সালাতুত দোহা এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদ। এ ছাড়া নবীজি ﷺ কোনো মানুষের সাথে দেখা করতে গেলে সেখানেও নফল সালাত আদায় করতেন। এই সালাতগুলো নিয়মিত আদায় করা যেকোনো মুসলিমের জন্যই কল্যাণকর। ভেবে দেখুন, আপনি যে দরজায় দৈনিক ৪০ বার ধরনা দিচ্ছেন, অন্য কোনো দরজা থেকে কি সেই দরজার চেয়ে দ্রুত জবাব আসবে কিংবা সে দরজার চেয়ে তাড়াতাড়ি খুলে যাবে?

চর.

রাতের সালাতে তিনি খুব বেশি আত্মনিমগ্ন হয়ে যেতেন। যার ফলে রবের সাথে তাঁর রাতের আলাপন ছিল সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য। এই মুহূর্তটা নবীজি ﷺ-এর জন্য ছিল সুগভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের সুবর্ণ সুযোগ।

পাঁচ.

এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক যে, নবীজি ﷺ-এর পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ হওয়ার নিশ্চয়তা সত্ত্বেও অবিরত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন। তাঁর দিনের শুরুই হতো

আল্লাহর কাছে ১০০ বার ক্ষমা চেয়ে। এক হালাকায় সাহাবীরা হিসাব করে দেখলেন যে, তিনি ১০০ বারেরও বেশি বলেছিলেন, “হে আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা করো, আমার তাওবা কবুল করো; তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ এবং তাওবা কবুলের ক্ষমতা আর কারও নেই।” রাতের নামাযেও তিনি অত্যন্ত আবেগী ভাষায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন, “আমার রব, আমার পূর্বের-পরের, গোপন-প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। আমার সে সকল গুনাহও ক্ষমা করে দাও, যা তুমি আমার থেকে বেশি জানো। তুমিই সন্মুখে অগ্রসর করাও, তুমিই পশ্চাদগামী করো। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তোমার ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই হয় না।”

নবীজি ﷺ-এর পূর্বের-পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছিল এবং তাঁকে সব ধরনের গুনাহ থেকেও সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। এরপরেও তিনি কত বেশি ক্ষমা চাইতেন আল্লাহর কাছে! আমাদের তাহলে কী করা উচিত, যেখানে একটামাত্র গুনাহ ত্যাগ করাও আমাদের জন্য চরম কষ্টসাধ্য হয়ে যায়? হে আমাদের রব, ক্ষমা করো আমাদের।

হয়.

নবীজি ﷺ সব সময়েই তাসবীহ এবং যিকির পাঠ করতেন। আপনি অনুভব করতে পারবেন যে, রবের প্রতি ভালোবাসা আর তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই ছিল জীবনভর তাঁর সমস্ত কর্মোদ্দীপনার কেন্দ্রবিন্দু। রবের দীদার লাভের উচ্চাশা নবীজি ﷺ-এর এত বেশি ছিল যে তিনি কখনোই তাঁর তাসবীহ পাঠ থেকে বিরত হতেন না। তিনি দিনের শুরু করতেন মহান আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করে এবং ঘুমানোর আগে তাঁর শেষ কাজ ছিল রবের কাছে দুআ চাওয়া। তাঁর সকাল এবং সন্ধ্যা শুরু হতো রহমানের উচ্চকিত প্রশংসায়। আর এই স্তুতিবাক্যগুলো তিনি সারাদিনই আওড়াতে থাকতেন। তাঁর এই আচরণগুলোই প্রমাণ করে রবের প্রতি তাঁর ভালোবাসার গভীরতা ও আনুগত্য, প্রমাণ করে মহান মালিকের পবিত্র গুণাবলিসমূহের সাক্ষ্য প্রদানে তিনি কতটা সচেতন!

সাত.

নবীজি ﷺ কেবল ইশা ব্যতীত সকল সালাতই ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করে নিতেন। ইশার সালাত আদায়ে তিনি মাঝেমধ্যে বিলম্ব করতেন।

শ্রোত.

নবীজি ﷺ সাধারণত ফরজ সালাতের পর সাহাবীদের সাথে কথা বলতেন, বিশেষ করে ফজর এবং যোহরের পর। কারণ, এই দুই সালাতের সময় ছিল রাতের গভীর ঘুম এবং মধ্য-দুপুরের ভাতঘুমের পরপরই। তাই ওই সময়গুলোতে মানুষ সতেজ এবং প্রাণবন্ত থাকত। আসর এবং ইশার পরে লোকেরা সাধারণত ক্লান্ত থাকত এবং বিশ্রাম নিতে চাইত। তাই এই সময়গুলোতে তিনি সচরাচর কথা বলতেন না। মাগরিবের পর তিনি সাহাবীদের সাথে কথোপকথন চালিয়েছিলেন বলেও কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। কারণ, তখন ছিল তাদের নৈশভোজের সময়। তাই মাগরিবের সালাত তিনি ওয়াক্তের শুরুতেই যথাসম্ভব সংক্ষেপে পড়তেন এবং এরপর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে কোনো বক্তব্যও রাখতেন না।

নয়.

নবীজি ﷺ তাঁর সকল কাজেই যথেষ্ট নিয়মানুবর্তী ছিলেন; স্বীয় দায়িত্ব পালন, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন পূরণ, ব্যক্তিগত ইবাদাত, দ্বীন প্রচার, পরিবারের তত্ত্বাবধান, সাহাবীদের তারবিয়াত, নিজের খেয়াল রাখা এবং অন্য সকল কাজই যথাসময়ে আদায় করতেন। তাঁর প্রত্যেকটা কাজই ছিল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। কোনো সঠিক কাজ আদায়ে কখনোই তিনি অলসতা কিংবা অপারগতা প্রকাশ করেননি। আপনি দেখবেন, তিনি প্রতিটা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করেছেন। আপনি আরও লক্ষ্য করবেন, মানুষকে তিনি যে সমস্ত কাজের নির্দেশ দিতেন, তা কতটা আন্তরিকতার সাথে নিজে সেই কাজগুলো করতেন : “তোমার শরীরের তোমার ওপর হক আছে, আছে তোমার চোখেরও; তোমার স্ত্রীর তোমার ওপর হক রয়েছে এবং হক রয়েছে তোমার অতিথিরও; সন্তানদের হক রয়েছে তোমার ওপর এবং তোমার ওপর হক রয়েছে তোমার বন্ধুদেরও।” তিনি নিজেই জীবদ্দশায় সকলের হক আদায়ের উত্তম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

দশ.

নবীজি ﷺ প্রতিটি মুহূর্তই কোনো-না-কোনো কাজে ব্যস্ত থাকতেন। অথচ এত কর্মব্যস্ততা স্বত্বেও তিনি কখনো কোনো কাজে ভুল করতেন না; বরং ঠান্ডা মাথায় সুন্দরভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর জীবনে দুশ্চিন্তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। তিনি কখনোই হতাশ হতেন না। আপনি যদি তাঁকে কোনো কাজ

করার সময় দেখতেন তাহলে ভাবতেন, না এই কাজটি করার আগে তিনি কোনো কিছু করেছেন আর না এই কাজ শেষ হওয়ার পর তাঁর অন্য কোনো কাজ করার আছে! পরিবারের সাথে তিনি যে মেজাজে থাকতেন তাতে বোঝার কোনো উপায়ই ছিল না যে বাইরে তাঁকে কত ভারী দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হতো! তাঁর সাহাবীদের সাথে সময় কাটানো দেখলে আপনার মনে হতো অন্য কোনো কিছুতেই বুঝি আজ তাঁর মনোযোগ নেই, আর না তিনি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন! নবীজি ﷺ তাদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতেন এবং অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে কথা বলতেন। তাঁর অভূতপূর্ব চারিত্রিক সৌন্দর্য তাই তাদের সকলেই অনুভব করতে পারতেন। তাঁর আচরণ দেখলে মনে হতো যেন সাহাবীদের সাথে মোলাকাত এবং তাদের প্রয়োজন পূরণই নবীজি ﷺ-এর একমাত্র কাজ। সব ধরনের দায়িত্ব সহজ এবং উদ্বেগহীনভাবে সম্পাদনে তিনি নিখুঁত সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন।

গায়ে.

তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, তবে মোটেও একঘেয়ে নয়। পরিস্থিতির প্রয়োজনে তিনি কখনো কখনো তাঁর দৈনন্দিন রুটিনে পরিবর্তনও আনতেন। নবীজি ﷺ-এর জীবনে বিশৃঙ্খলা বা গোলমালের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, আর না ছিল কঠোরতা বা নীরসতা। নমনীয়তা এবং নিয়মশৃঙ্খলার এই অপূর্ব সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতকে কেন্দ্র করে। সালাতের সময় নির্ধারিত থাকায় সেগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে কী কী করতে হবে তা সহজেই ঠিক করে ফেলা যেত। পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি সাহাবীদের সাথে সাক্ষাতের সময়সূচি নির্ধারণ করতেন। এভাবেই নবীজি ﷺ নিয়মানুবর্তিতার ইতিবাচক দিকগুলো থেকে উপকৃত হতেন এবং একঘেয়েমি আর কঠোরতার মতো নেতিবাচক দিকগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারতেন।

খাওয়া.

নবীজি ﷺ-এর জীবনযাত্রা ছিল নিতান্তই সহজ-সরল। অস্বাভাবিক গাভীর্ষ এবং কঠোরতার প্রান্তিকতা তাঁর আচরণের সাথে একদমই মানানসই ছিল না। অন্যদিকে স্বতঃস্ফূর্ততাই ছিল নবীজি ﷺ-এর সহজাত বৈশিষ্ট্য। যে কারও খুশিতেই তিনি শরীক হতেন, ভালোবাসতেন সাহাবীদের সঙ্গে এবং আনন্দদায়ক সবকিছুই যে তিনি উপভোগ করতেন তা প্রকাশ করতেও তিনি তৎপর ছিলেন। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ভালোবাসার মানুষগুলো ফিরে আসলে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ

করতেন। তিনি এ কাজে এতই তাড়াহুড়া করতেন যে, দ্রুততার আতিশয্যে তাঁর পোশাকের ওপরের অংশ কাঁধ থেকে পড়ে যেত। পথ চলতে গিয়ে তিনি হয়তো রাস্তার পাশে থেমে যেতেন শুধু জবাইকৃত ভেড়ার চামড়া ছাড়ানো কোনো যুবকের সাথে একটু সময় কথা বলার জন্য। তিনি তাঁর জামার হাতা গুটিয়ে সেই যুবককে শেখাতেন কীভাবে সহজেই নিখুঁতভাবে ভেড়ার চামড়া ছাড়ানো যায়। হয়তো প্রিয় নবীজি ﷺ এমন কারও পাশ দিয়ে কখনো যাচ্ছিলেন যে গোশত রান্না করছিল। তখন তিনি এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করতেন গোশত রান্না শেষ হয়েছে কি না। রান্না হয়ে গেলে তিনি পাতিল থেকে কিছু গোশত নিয়ে যেতেন।

মানুষের সাথে এত সহজভাবে মিশতে পারার দক্ষতাই দাওয়াহর পথে তাঁর সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা অনেকখানি দূর করে দিয়েছিল। তিনি খুব সহজেই সাহাবীদের সাথে হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম ছিলেন। নবীজি ﷺ এমনভাবে সাহাবীদের খেয়াল রাখতেন যেভাবে কোনো পিতা তাঁর পুত্রের ক্ষেত্রে করে থাকে।

ডেরো.

তাঁর পরিবার, বৈঠকের আসর এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে তাঁর সমগ্র জীবনটাতেই অল্পবিস্তর আমোদপ্রমোদ এবং বিনোদনের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। বাড়িতে পরিবারের মানুষদের সাথে তিনি সব সময়ই হাসিখুশি থাকতেন। নবীজি ﷺ-এর বৈঠকসমূহে প্রায় সময়ই হালকা রসিকতা এবং আনন্দদায়ক আলাপ-আলোচনার সুযোগ ছিল। তিনি মসজিদে আবাসিনীদের খেলা উপভোগ করতে তাঁর স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসতেন। তিনি তাদের বলতেন, “তোমাদের খেলা চালিয়ে যাও, হে বনী আরফিদাহ; যাতে করে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা বুঝতে পারে আমাদের ধর্মে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই স্থান রয়েছে। আমাকে এক পরিশুদ্ধ এবং সহনশীল বার্তাপ্রচারক হিসেবে পাঠানো হয়েছে।”

নিঃসন্দেহে তাঁর প্রচারিত সত্যের বাণী ছিল কোমল এবং তিনি মানুষকে বিনোদন এবং আমোদ-প্রমোদের যথেষ্ট সুযোগ দিতেন।

চৌদ্দ.

লক্ষণীয় যে, নবীজি ﷺ-এর পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত আবেগময়। স্ত্রী-কে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দেয়া কিংবা তার মুখে এক লোকমা খাবার তুলে দেয়া, রাতের

রোমান্টিক কথোপকথন, পরিজনদের খোঁজ রাখতে দিনের ঝটিকা সফর, পরিবারের প্রয়োজনে যেকোনো সময় পাশে থাকা, বিছানায় এক চাদরের নিচে স্ত্রীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সময় কাটানো এ রকম অসংখ্য ছোট ছোট কাজের মাধ্যমেই পরিবারের প্রতি তাঁর ভাবাবেগপূর্ণ আচরণ অভিব্যক্ত হয়।

পনেরো.

মানুষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজন এবং গতিবিধি সম্পর্কে নবীজি ﷺ-এর বোধশক্তি ছিল অবাক করার মতো। এমনকি ইবাদাতের সময়ও তিনি মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রাখতেন। জামাতের ইমামতি করার সময় তিনি সালাত অল্প সময়ে আদায় করতেন। কিন্তু যখন একা দাঁড়াতে তখন লম্বা সময় ধরে সালাত আদায় করতেন। দীর্ঘ করার অভিপ্রায়ে সালাত শুরু করা সত্ত্বেও কোনো বাচ্চার কান্নার আওয়াজ কানে পৌঁছালে তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। কারণ, তিনি এই কান্নারত শিশুর মায়ের উদ্বেগ অনুভব করতে পারতেন।

ষোল.

নবীজি ﷺ-এর দিনলিপি যথাযথভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাব যে, তাঁর সর্বাধিক প্রগাঢ় ইবাদাত, যাতে তিনি গভীরভাবে আত্মনিমগ্ন হয়ে যেতেন তা হচ্ছে কিয়ামুল লাইল, যা তিনি গৃহাভ্যন্তরে রাতের আঁধারে একাকী আদায় করতেন। সমগ্র জীবনভর নিয়মিত তিনি রাতের ইবাদাতের এই অভ্যাস অব্যাহত রেখেছিলেন।

উক্ত বিষয়টা বাস্তবিকই নবীজি ﷺ-এর নবুয়্যতের একটা প্রমাণ। সারাটা জীবন ধরে এই মহামানবের মতো ইবাদাতের ক্ষেত্রে এ রকম একনিষ্ঠতা প্রদর্শন কোনো প্রতারকের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না। সুতরাং এটাই সেই সত্যের প্রতি গভীর বিশ্বাসের প্রমাণ বহন করে, যা তিনি প্রচার করে গেছেন।

সতেরো.

নবীজি ﷺ-এর কর্মতৎপরতাকে মোটামুটি তিনটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় :

শেষ রাতের শান্ত সতেজতা এবং প্রাণশক্তির পর্যায় : ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ ঘুমের পর নবীজি ﷺ এ সময় রাতের সালাত আদায় করতেন। দিনের প্রথম প্রহরেই তিনি ঘুমিয়ে যেতেন। রাতের সালাত শুরু করার পূর্বে নবীজি ﷺ সর্বোচ্চ সজীবতা নিশ্চিত করতে চাইতেন। কারণ, এই সালাতই ছিল তাঁর অন্তরের প্রশান্তি এবং চোখের

শীতলতা।

ফজর সালাতের পর : ভোরের ঈযৎ ঘুমের পরপরই এই পর্যায়ের শুরু। তিনি এ সময় ফজরের সালাত এবং সকালের জিকির সম্পন্ন করতেন। এরপর সাহাবীদের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশও দিতেন।

যোহর সালাতের পর : এই পর্যায় আরম্ভ হতো দুপুরের ভাতঘুমের পর। তিনি তখন যোহরের সালাত আদায় করতেন এবং কোনো সম্ভাব্য ঘটনা সম্পর্কে সাহাবীদের অবগত করতেন অথবা বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে তাদের সাথে বসতেন।

শ্রোতারো.

দৈনিক ফরজ নামাযগুলো ছিল সুস্পষ্টভাবে সময় বণ্টনের সন্ধিক্ষণ। দিনের সময় এই নামাযগুলো দ্বারা সুন্দরভাবে বিভক্ত। নিচে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়কে কেন্দ্র করে নবীজি ﷺ-এর দৈনিক কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো :

ফজর : ভোরের ভাতঘুম শেষ করে নবীজি ﷺ জামাতে ফজরের সালাত আদায়ের পর সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত সাহাবীদের সাথে মসজিদে বসে থাকতেন। তারপর একে একে সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। সাক্ষাতের পর্ব শেষ হলে, সকালে সাহাবীদের দ্বীনী বিষয়-আশয় শিক্ষা দেয়ার জন্য একবার মজলিসে বসতেন। এরপর তিনি কারও-না-কারও সাথে দেখা করতে যেতেন। কখনো স্বীয় কন্যাদের সাথে, অথবা কখনো সাহাবীদের সাথে মিলিত হতেন। আবার কখনো নিজের কোনো প্রয়োজন থাকলে সেরে নিতেন। মধ্যদুপুর ছিল তাঁর ভাতঘুমের জন্য নির্ধারিত সময়। যোহরের আগেই তিনি বিশ্রাম গ্রহণ এবং রাতের সালাতের জন্য শরীরকে চনমনে করতে হালকা ঘুমিয়ে নিতেন।

যোহর : নবীজি ﷺ দুপুরের হালকা ঘুম শেষ করে জামাতে যোহরের সালাত আদায় করতেন। ইতিমধ্যে কোনো কিছু ঘটে থাকলে সালাত শেষ করে তিনি সাহাবীদের সে সম্পর্কে অবহিত করতেন। সাহাবীদের উদ্দেশে বেশির ভাগ বক্তব্যই তিনি এই সময়ে দিতেন। তারপর ঘরে ফিরে তিনি যোহরের দুই রাকাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ আদায় করতেন। সালাত শেষে তিনি আবার মসজিদে এসে সাহাবীদের সাথে কিছুক্ষণ বসতেন। আবার কখনো কখনো অন্য কোনো কাজ থাকলে তাও করতেন। যোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়টা ছিল তাদের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেয়ার মুহূর্ত।

আসর : নবীজি ﷺ আসরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে ১২^৫ শেষ করে সকল স্ত্রীর সাথে দেখা করতেন। কখনো তিনি আলাদা করে প্রত্যেকের ঘরে যেতেন, আবার কখনো স্ত্রীরা সকলে মিলে যার নির্ধারিত দিন থাকত তার ঘরে একত্র হতেন। আসর এবং মাগরিবের মধ্যবর্তী সময় তিনি মূলত পরিবারের সাথেই চিত্ত-বিনোদনে কাটাতেন।

মাগরিব : নবীজি ﷺ মাগরিব শুরুর সাথেই সাথেই সালাত আদায় করে নিতেন। অতঃপর রাতের খাবার গ্রহণ করতেন। নৈশভোজই ছিল আরবদের দিনের প্রধান ভোজ।

ইশা : নবীজি ﷺ জামাতে ইশার সালাত আদায় করে বাড়ি ফিরে যেতেন। এরপর হয় পরিবারের সাথে কিছু সময় কাটাতেন, নতুবা আনসারী কোনো সাহাবীর সাথে দেখা করতে চলে যেতেন। আবার কখনো কখনো আবু বকর রা. এবং উমর রা.-র বাড়িতে মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে কিছু সময় অতিবাহিত করতেন। অতঃপর তিনি ঘরে ফিরে আসতেন এবং মধ্যরাত অব্দি ঘুমিয়ে কাটাতেন। জেগে উঠে এরপর রাতের সালাত আদায় করতেন। এই সময়টাতেই সবচেয়ে দীর্ঘ ঘুমের পর তিনি জেগে উঠতেন। ফলে তখন তিনি বেশি সতেজ থাকতেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় নবীজি সালাত এবং দুআতেই অতিবাহিত করতেন। রাতের এক-ষষ্ঠাংশ বাকি থাকতে তিনি বিছানায় শুয়ে একটু জিরিয়ে নিতেন। ফজর সালাত পর্যন্ত এটাই ছিল তাঁর ভোরের হালকা ঘুম।

উনিশ.

নবীজি ﷺ-এর দিনলিপিই যেন তাঁর নবুয়্যতের একটা সুস্পষ্ট দলীল। যারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখছে তারাই অনুধাবন করেছে যে, তিনিই আল্লাহর নবী, যার কাছ থেকে উধ্বাকাশ থেকে ওহী নাযিল হয়। যারাই তাঁকে পর্যবেক্ষণ করেছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তিনি কখনোই কারও সাথে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হননি, কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি কখনোই তাঁর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না। মুসলিমরা সুমামাহ ইবনে 'উসালকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসে, যার কাছে নবীজিই ﷺ ছিলেন সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ। বন্দী করে নিয়ে আসার পর নবীজি ﷺ তাকে মসজিদের একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন। যখন সুমামাহ নবীজির সমগ্র দিনের কার্যবিধি অর্থাৎ মসজিদে তাঁর আসা যাওয়া এবং মানুষের সাথে তাঁর আচরণ লক্ষ করল তখন সে অনুধাবন করল যে মুহাম্মদ

[১২৫] সালাতের ওয়াক্ত শুরুর সাথে সাথে

ﷺ কোনো রাজা বা শাসক নন। সে নির্দিধায় স্বীকার করে নিল যে, তিনিই আল্লাহর নবী। কিছুদিন তাঁকে এই অবস্থায় রাখার পর নবীজি ﷺ সুমামাহকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং স্বাধীনভাবে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অবকাশ দিলেন। সুমামাহ মুক্তি পেয়ে সোজা গিয়ে গোসল করে ফিরে আসলেন। তিনি নবীজি ﷺ-এর সামনে গিয়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর শপথ! হে রাসূল, আপনার থেকে বেশি ঘৃণা আমি পৃথিবীর আর কাউকেই করতাম না। অথচ এখন আপনিই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আপনার ধর্মের থেকে বেশি ঘৃণা আমি আর কোনো ধর্মকেই করতাম না। আর এখন আপনার ধর্মকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। আপনার শহরের থেকে বেশি অপছন্দ আমি আর কোনো শহরকেই করতাম না। কিন্তু এখন এই শহরই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।”

একই রকম অবস্থা হয়েছিল আদী ইবনে হাতিমের রা.; যিনি ছিলেন একজন খ্রিষ্টান এবং নিজ গোত্রের প্রধান। তিনি যখন নবীজি ﷺ-এর সাথে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন বাচ্চাকে সাথে নিয়ে আসা এক নারী তাঁকে ডাকল। আদী রা. বললেন, “তারা গোপনে নবীজি ﷺ-এর সাথে কথা বললেন, যেহেতু তিনি তাদের সাথে দাঁড়ানো ছিলেন। আমি তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দীর্ঘসময় তিনি তাদের সাথে কথাবার্তা চালালেন। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, “আমি নিশ্চিত যে, আপনি না আমার ধর্মের অনুসারী আর না নুমান ইবনে মুনযিরের ধর্মানুসারী। আপনি যদি কোনো রাজা হতেন তবে কোনো নারী বা বালক আপনাকে এত দীর্ঘসময় আটকে রাখতে পারত না। আপনার প্রতি আমার হৃদয়ের উষ্ণতা আমি তখনই অনুভব করতে পারলাম।” এই ঘটনার পরই আদী রা. ইসলাম গ্রহণ করেন।

বিঃ.

দিনলিপি থেকেই বোঝা যায় নবী মুহাম্মদ ﷺ কতটা সুখী এবং মনোরম জীবনযাপন করতেন। যে সীমাহীন প্রশান্তি তিনি ঈমানের শক্তি থেকে লাভ করেছিলেন, তা আর কারও পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনিই সেই মহামানব, যিনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি জানতেন এবং আল্লাহর প্রতি এত দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন, যা আর কেউই করতে সক্ষম নয়।

মেরাজের রাতে তিনি উর্ধ্বাকাশে এত উঁচুতে আরোহণ করেছিলেন যেখান থেকে

ভাগ্যলেখক ফেরেশতাদের কলমের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, যারা রবের আদেশ লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁকে জান্নাত দেখানো হয়েছিল, যার মাটি ছিল মিশকের সুগন্ধিযুক্ত এবং নুড়ি-পাথরগুলো ছিল মুক্তোর। তিনি জান্নাতের কিছু ফলও সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। জান্নাতের আল-কাউসার নহরও নবীজি ﷺ স্বচক্ষে দেখেছিলেন।

আমরা কি ভাবতে পারি, এত উচ্চ মর্যাদা লাভের পর নবীজি ﷺ-এর কী রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়েছিল এবং এর ফলে তিনি কীভাবে রবের কাছে দুআ করেছিলেন, রবের হামদ-প্রশংসা বর্ণনা করেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, “আমি সেই প্রভুর সাথেই থাকি, যিনি আমাকে খাওয়ান এবং পানীয় দান করেন।” নবীজি ﷺ-এর ইবাদাতকালীন আনন্দানুভূতি কিংবা ঈমানের যে সুমিষ্ট স্বাদ তিনি অনুভব করেছেন, তা দুনিয়ার অন্য কোনো আনন্দ বা সুখানুভূতির সাথে তুলনীয় নয়।

তদুপরি তিনি তাঁর দুনিয়ার জীবন নিয়েও ছিলেন সন্তুষ্ট। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটা পরতে পরতে আমরা সেই সুখের ছোঁয়া উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। আর সেই প্রসন্নতার সমাদর এবং রহমানের কৃতজ্ঞতা আদায়ে তিনিও কখনো কার্পণ্য করেননি। আল্লাহই তাঁকে উদ্বিগ্ন এবং দুঃখানুভূতি থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং যাবতীয় রোগ-শোক থেকে হেফাজত করেছেন। শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতাসম্পন্ন এক সুখী-সুন্দর জীবন উপভোগ করেছেন তিনি। তাঁর জীবনকে স্থায়ী এবং সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর হিসেবেই চিত্রায়িত করা যায়। তিনি প্রেমময়ী স্ত্রী লাভ করেছিলেন যাদের সাথে নিজের ভালোবাসার আদানপ্রদান করতে পারতেন। নবীজি ﷺ স্বীয় স্ত্রীদের সাথে নির্ভেজাল ভালোবাসা এবং মমতা ভাগাভাগি করে নিতেন। পুণ্যবতী কন্যা এবং দুই পুত্র ছিলেন তাঁর দুনিয়াবী জীবনে পাওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামাত। তাদের তিনি মাতাপিতার সুমিষ্ট ভালোবাসার স্বাদ উপভোগ করিয়েছেন। আবু বকর এবং উমর রা. এর মতো সর্বাধিক সত্যবাদী মানুষেরাই ছিলেন তাঁর সাথি। তাদের সাথে সারা জীবনের দায়িত্বের বোঝা ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, “আবু বকর এবং উমরের সাথেই আমার শুরু; তাদের সাথেই আমি পথ চলেছি; আর আবু বকর এবং উমরের সাথেই আমার প্রস্থান।” তাঁর জামাতা আলী ইবনে আবু তালিবকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। স্বয়ং আল্লাহও যে তাকে ভালোবাসতেন এটি নবীজি ﷺ-এর অজানা ছিল না। আলী রা. তাঁর কাছাকাছিই বাস করতেন। নবীজি ﷺ-এর অন্যান্য জামাতারাও ছিলেন তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত। তারা তাঁকে যা-ই বলতেন, নিষ্ঠার সাথে বলতেন এবং যে ওয়াদাই করতেন তা

পূরণ করতেন। নবীজির অন্য দুই জামাতা ছিলেন উসমান ইবনে আফফান রা. এবং আবুল আস ইবনে আল-রাবী রা.। এ ছাড়াও নবীজির সঙ্গী ছিলেন অসংখ্য অনুগত সাহাবা। তাদের বিশ্বাস এবং হৃদয়ানুভূতির প্রশংসা করে মহান আল্লাহ বলেন,

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ

“আল্লাহ জানতেন তাদের অন্তরে কী আছে, এ জন্য তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন।” ১২৬

এভাবেই নবীজি ﷺ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। নবীজি ﷺ সারা জীবন একের পর এক সাফল্য অর্জন করে গেছেন। আর জীবনের সবচেয়ে অধিক সুখানুভূতি সাফল্য লাভের মাধ্যমেই অনুভূত হয়। মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানের গুরুদায়িত্ব তিনি সুচারুরূপে পালন করেছেন এবং দলে দলে মানুষকে ইসলামে প্রবেশ করতেও স্বচক্ষে দেখে গেছেন।

আমি কোনোভাবেই নবীজি ﷺ-এর সেই পরিতৃপ্তি কল্পনা করতে পারব না, যা তিনি মসজিদে উত্তরোত্তর মুসল্লীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে এবং দুনিয়ায় ইসলামের ত্বরিত প্রসার দেখে কিংবা দলে দলে মানুষের ইসলাম গ্রহণ করা দেখে অনুভব করেছিলেন। এমনকি আমি নিজেই নিজের অনুভূতি বর্ণনা করতে সক্ষম নই, যখন আমি নবীজি ﷺ-এর বিদায় হজ্জের অনুভূতি নিয়ে কল্পনা করার চেষ্টা করি। সেখানে তিনি সুবিশাল জনতার ভিড় অবলোকন করেছিলেন, যারা সমস্বরে ঘোষণা করেছিল, “আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর বাণী আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন।”

এই সকল কিছুই ছিল রবের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট পৌঁছে দেয়া কিছু প্রাচুর্য। মহান আল্লাহ নবীজিকে ﷺ সম্বোধন করে বলেছেন,

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

“শীঘ্রই আপনার রব আপনাকে এত দেবেন যে আপনি খুশি হয়ে যাবেন।” ১২৭

[১২৬] সূরা আল-ফাতহ ৪৮:১৮

[১২৭] সূরা দোহা ৯৩:৫

প্রশংসা.

তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করলে আমরা দেখব, তিনি সুখ-সমৃদ্ধির কদর করেছেন, জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন এবং এত এত নিয়ামত বর্ষণ করায় রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করেছেন। এক চুমুক পানীয় পানের পর কিংবা এক লোকমা খাবার গ্রহণের সাথে সাথেই তিনি আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে ভুলতেন না। তিনি বলতেন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের যথেষ্ট খাবার এবং পানীয় দান করেছেন। আমাদের প্রভুর প্রতি কখনোই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না। আমরা না তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, আর না তাঁর নিয়ামতের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করতে পারি। হে আমাদের রব, তুমিই আমাদের খাদ্য-পানীয় ও ধন-সম্পদ দান করেছ এবং আমাদের পথপ্রদর্শন করেছ ও জীবন দান করেছ।”

যখন তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠতেন তখনো ভালো ঘুম উপভোগের জন্য তাদের কথা চিন্তা করে রবের কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন, যারা প্রতিনিয়তই নিদ্রাহীনতায় ভুগছে। তিনি পুরোপুরি সতেজ হয়ে ঘুম থেকে উঠতেন এবং এটা যে আল্লাহর অনুগ্রহের ফলেই সম্ভব হয়েছে তা স্মরণ করতেন। তিনি ঘুম থেকে জেগেই বলতেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।”

সচরাচর খাবার গ্রহণ এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তিনি অত্যন্ত পরিতৃপ্তি অনুভব করতেন এবং মুখেও তাঁর স্বীকৃতি প্রদান করতেন। অথচ প্রতিদিন নিয়ামাত উপভোগের ফলে এই অনুভূতি খুব সাদামাটা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তাহলে চিন্তা করে দেখুন তাঁর সেই পরিতৃপ্তির মাত্রা, যা তিনি নতুন নতুন এবং ক্রমাগত নিয়ামত লাভের পর অনুভব করতেন। আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, প্রতিবারই নিয়ামত লাভের পর তিনি যথাযথরূপে রবের কৃতজ্ঞতা আদায়ে তিনি কিছুটা সময় ব্যয় করতেন। আমরা প্রায়ই স্বীয় প্রভুকে স্মরণ করে তাঁকে বলতে শুনি, “সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার ওপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন এবং আমাকে সীমাহীন নিয়ামাত দান করেছেন। সকল পরিস্থিতিতেই সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর।”

আমাদের কাছে একদম স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া জিনিসগুলোর মূল্য আমরা খুব একটা

অনুধাবন করতে পারি না, কিন্তু তা যে আসলেই কতটা অমূল্য, সে দিকেই নবীজি ﷺ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। যেমন : রাতের নিরাপদ ঘুম, দিনের খাবার কিংবা সুন্দর স্বাস্থ্য ইত্যাদি। তিনি বলেন, “যে-ই নিরাপদে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করে এবং দিনে খাবার গ্রহণ করতে পারে সে যেন দুনিয়ার যাবতীয় সুখই উপভোগ করল।” এই সাদামাটা জিনিসগুলোর কী অদ্ভুত সুন্দর প্রশংসাই-না তিনি করেছেন, যার অধিক প্রশংসা আর কেউই করতে সক্ষম নন।

আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতসমূহ এবং তাঁর অনুগ্রহ যখন আমরা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করব তখন এসবের মিষ্টতা আমরা আনন্দন করব, এগুলো উপভোগের ফলে আমাদের সুখানুভূতি আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে। এই অনুভূতি আমাদের জীবনকে আরও বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে তুলবে। সেই সত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমাদের হৃদয় টাইটুম্বর হয়ে উঠবে, যিনি স্বীয় অনুগ্রহের বদৌলতে আমাদের এত সব নিয়ামাত দান করেছেন। এভাবেই একটি নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের ফলে আরও নিয়ামাত আসতে থাকে, যা আমাদের জীবনকে আরও অধিক সুখী, সমুজ্জ্বল এবং উর্বর করে তোলে।

বাইশ.

চলুন দেখে আসা যাক, রাসূল ﷺ-এর ব্যস্ত দিনলিপি এবং কীভাবে এই ব্যস্ততার সাথে তিনি সানন্দে মানিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর স্মরণ করি, সেসব কষ্ট-ক্লেশের কথা, যা তাঁর জীবনে আঘাত হেনেছিল এবং কেমন করে তিনি সেই দুঃসময় পার করেছিলেন। শিশুকালে তাঁকে একের পর এক প্রিয়জন হারানোর ব্যথা সহ্যে হয়েছে। তিনি পিতা-মাতা এবং দাদাকে শৈশবেই হারিয়েছেন। নবুয়্যত প্রাপ্তির পর তাঁকে সীমাহীন নির্যাতন নিপীড়ন ভোগ করতে হয়েছে। উপরন্তু হারিয়েছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী, প্রিয়তমা খাদিজা রা.-কে। জীবদ্দশায় তিনি ছয় সন্তানের মৃত্যু স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। যে শহরকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন সেই শহর ত্যাগে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল। উহুদের যুদ্ধে নবীজি ﷺ অসংখ্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয় সাহাবীদের হারিয়েছিলেন। তাঁর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল যখন তাঁর নিষ্কলঙ্ক প্রিয়তমা স্ত্রীকে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এ ছাড়াও তিনি আরও অনেক কষ্টকর মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

এতৎসত্ত্বেও, সব ধরনের নেতিবাচক অনুভূতিকে দূরে ঠেলে দেয়ার অভূতপূর্ব ক্ষমতা ছিল নবীজি ﷺ-এর, ছিল জীবনকে পুনর্বার চালিত করার অপারিসীম সঞ্জীবনী শক্তি

এবং প্রতিটা মুহূর্তের সাথে ইতিবাচকভাবে মানিয়ে নেয়ার মতো দক্ষতা।

এ কারণে তাঁর সমৃদ্ধ জীবনের প্রতি আলোকপাত করলে মনে হবে যেন, তিনি কখনোই কোনো কষ্টকর অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষার সম্মুখীন হননি। অথচ সত্য এটাই যে, নবীজি ﷺ এত নিশ্চিত জীবন উপভোগ করেননি। তবে সকল ধরনের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভের অভাবনীয় দক্ষতা ছিল তাঁর। তাঁর জীবনের প্রতিটা মুহূর্তেরই কোনো-না-কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল। তথাপিও তিনি সে জীবনে আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর জীবন যেন প্রতিটা মুহূর্তেই নবরূপ লাভ করত, নিরবচ্ছিন্ন ছিল এর ছুটে চলা। তিনি সেভাবেই জীবন কাটিয়েছেন যেভাবে কাটানো উচিত ছিল।

তাইশ.

আমরা বিস্মিত হই, সাহাবীদের জীবনের মাঝেও যখন আমরা প্রিয় নবীর ﷺ সচেতন ও সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করি, যখন আমরা তাদের সাথে নবীজির প্রাণশক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা দেখি। আমরা তাই নির্দিধায় বলতে পারি যে, প্রত্যেক সাহাবীর সাথেই নবীজি ﷺ-এর কোনো বিশেষ ঘটনা কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন আছে। তিনি তাদের নবজাতকদের দেখতে যেতেন, কোলে নিতেন। সেই নবজাতকেরা প্রথম যে জিনিসের স্বাদ নিত, তা ছিল নবীজি ﷺ-এর পবিত্র থুতু মোবারক এবং তাঁর বরকত। তাদের দাসরা দিনের প্রথম প্রহরেই নবীজি ﷺ-এর সাহচর্য পেতে তাঁর মসজিদে জড়ো হতো এবং তিনি তাঁর মোবারক হাত তাদের পানির পাত্রসমূহে ডুবিয়ে দিতেন। ছোট ছোট বাচ্চারা সাথে রাস্তায় দেখা হলে তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে দিতেন এবং বলতেন তিনি তাদের কতটা ভালোবাসেন। তিনি কোনো বালকের চেহারায় পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন, ছোট কোনো মেয়েকে রঙিন কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন এবং এভাবেই প্রতিটি বাচ্চার জীবনেই কোনো-না-কোনো সুখস্মৃতির সাক্ষী হয়ে আছেন প্রিয় নবীজি ﷺ। সাহাবীরা যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন এবং মোবারক হাতের সুগন্ধ তাদের হাতে ছুঁয়ে দিতেন। তিনি তাদের বাড়িতে যেতেন এবং তাদের সাথে খাবার খেতেন। তাদের আনন্দময় মুহূর্তে তিনি শরীক থাকতেন, যা তাদের আনন্দ বহুগুণ বাড়িয়ে দিত। গোশত ভক্ষণের জন্য উট জবাই করার মুহূর্তে তারা তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি আসলেন, দেখলেন এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করলেন। হাবশী গোলামদের মসজিদে খেলার দৃশ্য তিনি উপভোগ করেছেন এবং তাঁর অনুভূতি তাদের কাছে প্রকাশও করেছেন এই বলে যে, “খেলা চালিয়ে যাও, হে বনু

আরফিদাহ।”

নবীজি ﷺ রোগাক্রান্ত সাহাবীদের দেখতে যেতেন। তারা জেগে উঠলে দেখতে পেতেন যে প্রাণপ্রিয় রাসূল তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর শীতল হাতের স্পর্শ তাদের ব্যথা দূর করে দিচ্ছে। তিনি তাদের জানাযায় অংশ নিতেন এবং তাদের প্রিয়জনদের কবরের পাশে দাঁড়াতেন। তাদের দুঃখে তিনি অশ্রুপাত করতেন। তারা চলে গেলে তিনি তাদের অভাব অনুভব করতেন। মজলিসে অনুপস্থিত সাহাবীদের খোঁজ নিতেন তিনি। সে বিষয়ে সেই সাহাবীদেরও অবহিত করা হতো। এভাবেই তাদের জীবনে ছিল নবীজি ﷺ-এর অশেষ ভূমিকা। সাহাবীদের জীবন আলোকিত হয়েছিল তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের বদৌলতে।

তাই তো মৃত্যুর পরও নবীজি ﷺ বাস্তব ছিলেন তাদের চিন্তা-চেতনায়, জীবন্ত ছিলেন তাদের হৃদয়ে, জ্বলজ্বল করেছিলেন তাদের চোখের তারায়। প্রত্যেকের সাথেই নবীজি ﷺ-এর আছে কিছু অবিস্মরণীয় স্মৃতি। তাঁর ব্যাপারে যখন সাহাবীরা আলোচনা করতেন তখন মনে হতো যেন তিনি সেই মুহূর্তে তাদের সামনে উপস্থিত আছেন। আপনি তাদের বলতে শুনবেন, “আমি যেন এই মুহূর্তে তাঁর পদযুগলের শুভ্রতা অবলোকন করছি...”; “যেন আমি তাঁর আংটির বলক দেখতে পাচ্ছি...”; “আমি এখনো তাঁর হাতের শীতলতা অনুভব করছি...”; “তাঁর হাত ছিল বরফের চেয়েও শীতল এবং মিশকের থেকেও বেশি সুগন্ধিযুক্ত...”; “আমি যেন এই মুহূর্তে তাঁর পায়ের শীতলতা আমার হাতে অনুভব করছি...”। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

চর্চাশেষ.

নবীজি ﷺ-এর দৈনিক রুটিন অধ্যয়ন তাঁর সম্মানিত সন্তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে তোলে। নিঃসন্দেহে তাঁর সাহাবীরা তাঁকে এতটা ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন যেমনটা অন্য কেউ কাউকে করেনি। এমনকি নবীজি ﷺ-এর জীবনের যে দিকই সাহাবীরা অবলোকন করেছেন তা-ই তাদের অন্তর তাঁর প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধায় ভরিয়ে দিয়েছে। নবীজি ﷺ-এর জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মুহূর্তের নিখুঁত বর্ণনা তাঁর প্রতি সন্ত্রম বাড়িয়ে দেয় এবং তাঁর প্রতি আকর্ষণকে আরও শক্তিশালী করে। তারা যেভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন তেমনটা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হলেও তা আমাদের জন্য জ্ঞানের উৎস নিঃসন্দেহে। সাহাবীরা যেভাবে নবীজিকে ﷺ দেখেছেন এবং শুনেছেন, আমরা যত বেশি সে সম্পর্কে জানব এবং অনুধাবন করব তত বেশি

আমরা সাহাবীদের মতো করেই নবীজিকে ﷺ ভালোবাসতে পারব। নবীজি ﷺ-এর পুরো দিনের কার্যবিধির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁর ভালোবাসায় আমাদের হৃদয় সমৃদ্ধ করে। তিনি এমন একজন মানুষ, যাকে আপনি যত বেশি জানবেন তত বেশি ভালোবাসবেন। যত অধিক তাঁর সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন ততটাই তাঁকে দিব্যচোখে দেখার আশা জাগবে।

প্রায় সময়ই নবীজি ﷺ-এর জীবনের কোনো একটা ঘটনা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আমি সময়ের ব্যবধানকে মিলিয়ে দিই যাতে করে সেই ঘটনা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তখন আমি তাঁকে আমার খুব কাছে অনুভব করি এবং তাঁর আলোয় গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। মনে হয় যেন আমি তাঁর নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ নিতে পারছি। আমার তখন ইচ্ছে হয় নুয়ে পড়ে তাঁর হাতে চুমু খেতে এবং তাঁর হাতের তালুর শীতল ছোঁয়া পেতে। হৃদয়ের সবটুকু আবেগ দিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় : “আল্লাহর শপথ, ওগো রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে ভালোবাসি আমার নিজের থেকেও বেশি।”

হে প্রভু, আমরা তোমার রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তাঁকে না দেখেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। ওগো প্রভু, তাঁর দর্শন লাভ হতে বিচার দিবসে আমাদের বঞ্চিত কোরো না। তাঁর অনুসারীদের সাথে আমাদের পুনরুত্থিত করো এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো, যাদের হয়ে তিনি তোমার কাছে শাফায়াত করবেন। তাঁর কাউসার থেকে পানি পানের এবং ফিরদাউসে আমাদের তাঁর সঙ্গ লাভের তৌফিক দিয়ো। আন্সিয়া (আ.), হেদায়াতপ্রাপ্ত, শহীদ এবং সৎকর্মশীলদের সাথে আমাদের থাকার তৌফিক দিয়ো, যাদের ওপর তুমি তোমার অপার অনুগ্রহ বর্ষণ করবে। কতই-না উত্তম তাদের সঙ্গ!

আমাদের রব, আমরা বিশ্বাস এনেছি সে সব জিনিসের ওপর, যা তুমি উর্ধ্বাকাশ থেকে আমাদের ওপর প্রেরণ করেছ এবং আমরা তোমার রাসূলের ওপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের নাম লিখে নিয়ো।

ওগো মালিক, নবী মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর পরিবারবর্গের ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করো যেমনভাবে শান্তি এবং অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর পরিবারবর্গের ওপর। যাবতীয় প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তুমি, তুমিই মহিমাময়।

গ্রন্থপঞ্জী

লেখকদের নামের বর্ণনাক্রম অনুসারে।

- আত তাবারানি, সুলাইমান ইবন আহমাদ; আল আহাদিস আত তিওয়াল।
- আত তাবারানি, সুলাইমান ইবন আহমাদ; আদ দুআ'।
- আত তাবারানি, সুলাইমান ইবন আহমাদ; আল মু'যাম আল আওসাত।
- আত তাবারানি, সুলাইমান ইবন আহমাদ; আল মু'যাম আল কাবির।
- আত তাবারানি, সুলাইমান ইবন আহমাদ; আল মু'যাম আস সাগির।
- আত তাবারানি, সুলাইমান ইবন আহমাদ; মাকারিম আল আখলাক।
- আত তাবারানি, সুলাইমান ইবন আহমাদ; মুসনাদ আশ শামি'ইয়িন।
- আত তাবারি, মুহাম্মাদ ইবনু জারির; তাযহিব আল আতহার।
- আত তাবারি, মুহিবুদ্দিন; আর রিয়াদ আন নাদিরাহ ফি মানাক্বিব আল আশারাহ।
- আত তাহাওয়ি, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ; শারহ মা'আনি আল আতহার।
- আত তাহাওয়ি, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ; শারহ মুশকিল আল আতহার।
- আত তায়ালিসি, আবু দাউদ সুলাইমান ইবন দাউদ; আল মুসনাদ।
- আত তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবন 'ইসা; আল জামি' আল মুখতাসার সুনান আত তিরমিযি।
- আত তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবন 'ইসা; কিতাব আল 'ইলাল আল কাবির।
- আদ দারাকুতুনি, আলি ইবন 'উমার; সুনান আদ দারাকুতুনি।
- আদ দারিমি, আব্দুল্লাহ; আল মুসনাদ।
- আদ দাইনুরি, আহমাদ ইবন মারওয়ান; আল মুজালাসাহ।
- আদ দুলাবি, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ; আল কুনা ওয়াল আসমাহ।
- আন নাসাঈ, আহমাদ ইবন শুয়াইব; আস সুনান আল কুবরা।
- আন নাসাঈ, আহমাদ ইবন শুয়াইব; সুনান আন নাসাঈ।
- আন নাবাওয়ি, ইয়াহিয়া ইবন শারাব; শারহ সাহিহ মুসলিম।

- আবু আওয়ানা, ইয়াকুব ইবন ইসহাক; আল মুসতাখরাজ।
- আব্দুর রাজ্জাক আস-সান'আনি; আল মুসান্নাফ।
- আব্দ ইবন হুমাইদ; আল মুসনাদ।
- আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ; ফাদাইল উসমান।
- আবুল ফিদা', ইমাদ উদ্দিন ইসমাইল ইবন আলি; আল মুখতাসার ফি আখবার আল বাশার।
- আবুল শাইখ; আখলাক আন নাবিঈ।
- আবুল শাইখ; আল আজামাহ।
- আবুল শাইখ; আল আমসাল।
- আবু বকর আশ শাফিঈ; আল গাইলানিয়াত।
- আবু দাউদ, সুলাইমান ইবন আল আশ'আছ; সুনান আবু দাউদ।
- আবু নুয়ইম, আল ফাদল ইবন দুকাইন; আস সালাব।
- আবু ইয়লা, আহমাদ ইবনু আলি; আল মুসনাদ।
- আবু ইউসুফ, ইয়াকুব ইবন ইবরাহিম; আল আছার।
- আয যাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ; সিয়র আ'লামিন নুবালা।
- আয যিরকলি, খাইরুদ্দিন; আল আ'লাম।
- আর রাফি'ই, মুসতাফা সাদিক, ওয়াহয়ি আল ক্বালাম।
- আর রামহুরমুযি, মুহাম্মাদ ইবন হারুন; আল মুসনাদ।
- আল আললা'ই- ইছরাত আল ফাওয়াইদ।
- আল আমিরি; বাহজাত আল মাহফিল ওয়া বুগইয়াত আল আমাছিল ফি তালকিস আল-মু'যিজাত ওয়াআ সিয়াল ওয়াস শামাইল।
- আল আইনি, বদর উদ্দিন মাহমুদ ইবন আহমাদ; উমদাত আল ক্বারি।
- আল আজিমাবাদি, মুহাম্মাদ শামসুল হক; আওন আল মা'বুদ শারহ সুনান আবু দাউদ।
- আল আওদাহ, সালমান; ফিকহুল ইবাদাহ।
- আল আজুররি, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন; আশ শারিয়াহ।
- আল আলবানি, মুহাম্মাদ নাসির উদ্দিন; আসল সিফাত সালাতুন নাবিঈ।
- আল আলবানি, মুহাম্মাদ নাসির উদ্দিন; ইরওয়া আল গালিল।

- আল আলবানি, মুহাম্মাদ নাসির উদ্দিন; সিলসিলাত আল আহাদিছ আস সাহীহাহ।
- আল ওয়াহিদি, 'আলি ইবন আহমাদ; আসবাব আন নুযুল।
- আল ক্বাদি, ইসমাইল; ফাদল আস সালাহ আলা আন নাবি।
- আল আসফাহানি, আবু নুয়াইম আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ; আল মুসতাখরাজ আলা সাহিহ মুসলিম।
- আল আসফাহানি, আবু নুয়াইম আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ; দালাইল আন নুবুওয়াহ।
- আল আসফাহানি, আবু নুয়াইম আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ; হিলইয়াত আল আওলিয়াহ।
- আল আসফাহানি, আবু নুয়াইম আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ; মা'রিফাত আস সাহাবাহ।
- আল আসফাহানি, আবু নুয়াইম আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ; সিকাতুল জামাহ।
- আল আসফাহানি, ইসমাইল ইবন মুহাম্মাদ; আত তাগরিব ওয়াত তারহিব।
- আল ইরাকি, আব্দুর রাহমান ইবনুল হুসাইন; মাহাজ্জাত আল কুরাব ইলা মাহাব্বাত আল আরব।
- আল ক্বাসতালানি, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ; ইরশাদ আস সারি।
- আল কুরতুবি, আহমাদ ইবন 'উমার; আল মুফহিম।
- আল ক্বুতাই'য়ি, আহমাদ ইবন জাফর; জুয'আল আলিফ দিনার।
- আল খাল্লাল, আবু বকর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ; আল আমর বিল মা'রুফ ওয়ান নাহিহ আনিল মুনকার।
- আল খারা'ইতি, মুহাম্মাদ ইবন জাফর; মাকারিম আল আখলাক।
- আল খারা'ইতি, মুহাম্মাদ ইবন জাফর; মাসাওয়ি' আল আখলাক।
- আল খাতিব আল বাগদাদি, আহমাদ ইবন আলি; আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ।
- আল খাতিব আল বাগদাদি, আহমাদ ইবন আলি; আল জামি' লি আখলাক আর রাওয়ি ওয়াল আদাব আস সামি'।
- আল খাতিব আল বাগদাদি, আহমাদ ইবন আলি; আল মুবহাম্মাত।
- আল খাতিব আল বাগদাদি, আহমাদ ইবন আলি; আল মুত্তাক্কিফ ওয়াল মুফতারিক।
- আল খাতিব আল বাগদাদি, আহমাদ ইবন আলি; গাওয়ামিদ আল আসমা আল মুবহাম্মাহ।
- আল খাতিব আল বাগদাদি, আহমাদ ইবন আলি; তারিখ বাগদাদ।
- আল জানাদি, আল মুফাদ্দাল ইবন ইবরাহিম; ফাদাইল আল মাদিনাহ।
- আল তুরাইরি, আব্দুল ওয়াহাব; কিসাস নাবাওয়িয়াহ।

- আল ফাকিহি, আখবার মাক্কাহ।
- আল ফাসাওয়ি, ইয়া'কুব ইবন সুফিয়ান; আল মা'রিফাহ ওয়াত তারিখ।
- আল ফিরইয়াবি, জাফর ইবন মুহাম্মাদ; দালাইল আন নুবুওয়াহ।
- আল বাগাওয়ি, আল হুসাইন ইবন মাসউদ; শারহুস সুন্নাহ।
- আল বায়হাকি, আহমাদ ইবন আল হুসাইন; আল আদাব।
- আল বায়হাকি, আহমাদ ইবন আল হুসাইন; আল আসমা ওয়াস সিফাত।
- আল বায়হাকি, আহমাদ ইবন আল হুসাইন; আল বা'হ ওয়ান নুশুর।
- আল বায়হাকি, আহমাদ ইবন আল হুসাইন; আদ দাওয়াতুল কাবির।
- আল বায়হাকি, আহমাদ ইবন আল হুসাইন; আল ই'তিকাদ।
- আল বায়হাকি, আহমাদ ইবন আল হুসাইন; আল ক্বাদা ওয়াল ক্বাদর।
- আল বায়হাকি, আহমাদ ইবন আল হুসাইন; আস সুন্নাহুল কুবরা।
- আল বায়হাকি, আহমাদ ইবন আল হুসাইন; দালাইল আন নুবুওয়াহ।
- আল বায়হাকি, আহমাদ ইবন আল হুসাইন; ইছবাত আ'দাব আল ক্বাবর।
- আল বায়হাকি, আহমাদ ইবন আল হুসাইন; শুয়াবুল ইমান।
- আল বাজ্জার, আবু বকর; আল মুসনাদ।
- আল বুখারি, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল; আল আদাবুল মুফরাদ।
- আল বুখারি, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল; আক ক্বিরা'আহ খালফ আল ইমাম।
- আল বুখারি, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল; আত তারিখুল কাবির।
- আল বুখারি, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল; খালক আফ'আল আল 'ইবাদ।
- আল বুখারি, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল; রাফউল ইয়াদাইন।
- আল বুখারি, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল; সাহিহ বুখারি।
- আল মাকদিসি, আব্দুল গনি; আহাদিস আল শি'র।
- আল মাকদিসি, আদ দিয়া'; আল আহাদিহ আল মুখতারাহ।
- আল মারওয়াযি, মুহাম্মাদ ইবন নাসর; আস সুন্নাহ।
- আল মারওয়াযি, মুহাম্মাদ ইবন নাসর; কিতাবুল উয়িতর।
- আল মারওয়াযি, মুহাম্মাদ ইবন নাসর; ক্বিয়ামুল লাইল।
- আল মারওয়াযি, মুহাম্মাদ ইবন নাসর; তা'যিম ক্বাদর আস সালাহ।

- আল মিনাওয়ি, মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ; ফাইদ আল কাদির।
- আল হাকিম, আন নিশাপুরি, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ; আল মুসতাদরাক আলা আস সাহিহইন।
- আল হুমাইদি, আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবন আল যুবাইর; আল মুসনাদ।
- আশ শাফিঈ, মুহাম্মাদ ইবন ইদরিস; আল মুসনাদ।
- আশ শাশি, হাইছাম ইবন কুলাইব; আল মুসনাদ।
- ইবন আব্দুল বার; আত তামহিদ।
- ইবন আছাকির, আলি ইবন আল হাসান; আল আরবা'ইন ফি মানাক্বি উম্মাহাত আল মু'মিনীন।
- ইবন আছাকির, আলি ইবন আল হাসান; মু'জাম ইবন আছাকির।
- ইবন আছাকির, আলি ইবন আল হাসান; তারিখ দিমাশক।
- ইবন আবি আছিম, আহমাদ ইবন 'আমর; আল জিহাদ।
- ইবন আবি আছিম, আহমাদ ইবন 'আমর; আস সুন্নাহ।
- ইবন আবি আছিম, আহমাদ ইবন 'আমর; আল আহাদ ওয়াল মাছানি।
- ইবনু আবিদ দুনইয়া; আল 'ইয়াল।
- ইবনু আবিদ দুনইয়া; আস সামত।
- ইবনু আবিদ দুনইয়া; আত তাহাজ্জুদ ওয়াল ক্বিয়ামুল লাইল।
- ইবনু আবিদ দুনইয়া; আত তা'ওয়াদু ওয়াল খুমুল।
- ইবনু আবিদ দুনইয়া; মাকারিম আল আখলাক।
- ইবনু আবিদ দুনইয়া; মুদারাত আন নাস।
- ইবনু আবিদ দুনইয়া; ক্বিসার আল আমাল।
- ইবন আবি হাতিম, আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ; আল 'ইলাল।
- ইবন আবি শাইবাহ, আবু বকর; আল মুসনাদ।
- ইবন আবি শাইবাহ, আবু বকর; আল মুসান্নাফ।
- ইবন আবি শাইবাহ, মুহাম্মাদ ইবন উসমান; আল আরশ।
- ইবন আল জা'দ, আলি; আল মুসনাদ।
- ইবনুল জাওযি, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবন আলি; কাশফ আল মুশকিল।

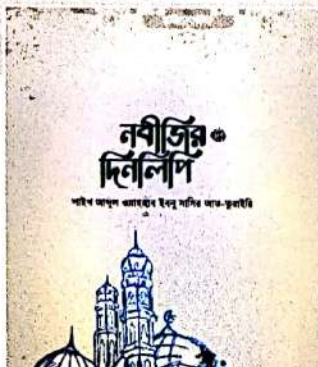
- ইবন আল মাগাযিল, আলি ইবন আল হাসান; মানাক্বিব 'আলি।
- ইবনুল মুবারাক, আব্দুল্লাহ; আল যুহুদ।
- ইবন আন নাজ্জার, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ; আদ দুররাহ আছ ছামিনাহ ফি আখবার আল মাদিনাহ।
- ইবনুস সুন্নি, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ; 'আমাল আল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ।
- ইবনুল ওয়ারদি, 'উমার ইবনু মুযাফফার; তারিখ।
- ইবন বাত্তাল, আলি ইবন খালাফ; শারহ সাহিহ আল বুখারি।
- ইবন হাজার আল আসকালানি, আহমাদ ইবন আলি; আল ইসাবাহ ফি তামিয়ায আস সাহাবাহ।
- ইবন হাজার আল আসকালানি, আহমাদ ইবন আলি; ফাতহুল বারি।
- ইবন হাজার আল আসকালানি, আহমাদ ইবন আলি; নাতা'ইয আল আফকার।
- ইবন হাজার, আত তালখিস আল হাবির।
- ইবন হাম্বাল, আহমাদ; আল আশরিবাহ।
- ইবন হাম্বাল, আহমাদ; আল মুসনাদ।
- ইবন হাম্বাল, আহমাদ; ফাদাইল আস সাহাবাহ।
- ইবন হিব্বান, মুহাম্মাদ; আছ ছিক্কাত।
- ইবন কাছির, ইছমাইল ইবন 'উমার; আল বিদায়াহ ওয়া আন নিহায়াহ।
- ইবন খুজাইমাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আন নিশাপুরি; আত তাওহিদ।
- ইবন মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াজিদ; সুনান ইবন মাজাহ।
- ইবন মানদাহ; মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক; কিতাবুল ইমান।
- ইবনুল কাইয়িম আল জাওয়িয়াহ, মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর; যা'দ উল মা'আদ।
- ইবন কুতায়বাহ, আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম; আল মা'আরিফ।
- ইবন রাওয়াউয়িহ, ইসহাক; আল মুসনাদ।
- ইবন রজব, আহমাদ ইবন আলি; ফাতহুল বারি।
- ইবন সা'দ, মুহাম্মাদ; আত তাক্বাত ওয়াল কুবরাহ।
- ইবন সাল্লাম, আল কাসিম; ফাদাইল আল কুরআন।
- ইবন সাল্লাম, আল কাসিম, কিতাবুল আমওয়াল।

- ইবন শাব্বাহ, 'উমার; তারিখ আল মাদিনাহ।
- ইবন জানযাওয়িহ, আহমাদ; আল আমওয়াল।
- মালিক; আল মুওয়াত্তা।
- মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহিম; হাদিস আস সিরাজ।
- মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ; সহিহ মুসলিম।
- হান্নাদ ইবন আস সিররি; আল যুহুদ।
- হিশাম ইবন 'আন্মার; হাদিস হিশাম ইবন 'আন্মার।

নবীজি!

কীভাবে তাঁর সকাল হতো? ঘুম থেকে উঠে তিনি
প্রথমে কী করতেন? তারপর কী করতেন? তারপর?
দুপুর কীভাবে কাটতো? সাঁঝের বেলায়? ঘুমানোর
আগে প্রিয় কাজ কী ছিল?

‘নবীজির দিনলিপি’ বইটিতে এমনভাবে নবীজি ﷺ
এর জীবনের দৈনন্দিন আমলগুলোকে পেশ করা
হয়েছে যা পড়ে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন
নবীজি কোন সময়টাতে ঠিক কী ধরনের আমল
করতেন আর সারাদিন এত প্রাণবন্ত কীভাবেই বা
থাকতে পারতেন। গল্পকথায় অনিন্দ্য রচনাশৈলীতে
লিখিত এ বই পাঠক পড়তে থাকবেন আর নিজেকে
অনুভব করবেন নববী জীবনের আরো কাছাকাছি।



الإسلام
মাহেদাওয়াতুল আসলাফ
দোকান নং: ১৮ (আভারমাউন্ড),
ইসলামি টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

